



ইতিহাস যুগে যুগে

[মধ্য যুগ]



অভিনব প্রকাশন

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৮১ সাল হইতে প্রবর্তিত নূতন পাঠক্রম অনুসরণে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের **সপ্তম শ্রেণীর** ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।
[*Vide T. B. No./VII/H/81/101, Dated 8. 1. 81*]

ইতিহাস যুগে যুগে

(মধ্য যুগ)

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীদীপ্তি প্রকাশ মণ্ডল, বি. এ., বি. টি., সার্ট-ইন. থিও.
ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক
স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল
কলিকাতা-৬

অভিনব প্রকাশন
৩০এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
সরস্বতী সাউ, বি. এস্‌-সি.
৩০এ, সীতরাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৭
সংশোধিত প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮০
পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮১
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮২
চতুর্থ সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮৪
পঞ্চম সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮৫

মূল্য ঃ এগার টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

নতুন বছর নিয়ে আসছে ইতিহাসের নতুন পাঠ্যসূচী—ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকের উদ্বেগের কারণ হয়ে। নতুন এক বিন্যাসে সজ্জিত হতে চলেছে ইতিহাসের এই নতুন পাঠক্রম। ফলে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার উপর অর্পিত হয়েছে এক গুরু দায়িত্ব। সপ্তম শ্রেণীর এই নতুন বইটি নতুন পাঠ্যসূচী নিয়ে আসছে। এর জন্য চাই প্রাঞ্জল ভাষা, চাই শৃঙ্খলাসম্মত পারস্পরিক অধ্যায়।

দীর্ঘ বছর ধরে শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছি। এই দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রছাত্রীদের সংস্পর্শে এসে জেনেছি, পঠন-পাঠনে কোথায় তাদের বিপত্তি ঘটে,—তাদের ধারণাশক্তি কোথায় বাধা পায়, ঠিক কোনখানে সংক্ষেপ করা দরকার, আবার কোথায় বিশদ বিবরণের প্রয়োজন—ছাত্রছাত্রীদের সঠিক উপলব্ধির জন্য।

জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকসমাজের কাছে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিবেদন করার জন্যই আমার এই মুখবন্ধ। ভাষার সাবলীল ভঙ্গী—চিন্তার স্বচ্ছতা—বাহুল্য বর্জন অথচ সারবস্তুর বিশদ বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় চিত্র ও মানচিত্রের সহযোগে ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল আমার পুস্তক রচনার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী যোজনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কতদূর সাফল্য অর্জন করেছি তার বিচারের ভার অর্পণ করি বরেণ্য শিক্ষকসমাজের উপর। এই বই যাদের উদ্দেশ্যে লেখা—তাদের কাজে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

কলিকাতা
৯ই মে, ১৯৮৩

বিনীত
গ্রন্থকার

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

'ইতিহাস যুগে যুগে—মধ্যযুগ' বইটি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সমাজের নিকট সমাদৃত হয়েছে—আশাতীত সুফল লাভ করা গেছে। তবুও বইটিকে সহজবোধ্য ও সুললিত করার জন্য এই সংস্করণে সব ধরনের প্রচেষ্টা হয়েছে। ভাষাকে আয়ত্ব করতে পারলে ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস পাঠ সহজ হয়, একথা মনে রেখে বইটির ভাষা সংস্কার করা হয়েছে যথাসাধ্য। 'অনুশীলনী'গুলিতে আরো অনেক ধরনের প্রশ্নের সমাবেশ ঘটেছে। তার ফলে ছাত্রছাত্রীরা সহজেই পাঠাংশের উত্তর নিজেরাই দিতে পারবে। মূল পাঠ্যবস্তু যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজেই উপস্থাপিত করা যায়, তার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ নিয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপদেশও গ্রহণ করেছি বইটির এই সংস্করণে।

আশা করি, বইটি এবার ব্যাপকতর ভাবে গ্রহণীয় হবে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের নিকট অনুরোধ, তাঁরা নূতন সংস্করণের পাঠ্যবস্তুর প্রতি সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করে তাঁদের মতামত জানালে বিশেষ কৃতজ্ঞ হব।

কলিকাতা
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৪

বিনীত
গ্রন্থকার

SYLLABUS IN HISTORY

For Class VII

HISTORY OF MEDIEVAL CIVILISATIONS

1. *Meaning of the Medieval*

(a) From overthrow of the last Roman Emperor in 476 A. D. to the rise of new society, new State, new learning, new economic patterns.

(b) In India—from the end of the Gupta Era although 'Feudal' relations had started from the 5th century.)

(c) The time period in both cases—roughly 5th century to 15th century A. D.

(d) Periodisation is arbitrary because of gradual transition, in some respect the old merging into the middle ages.

(e) Middle – ages not the same period everywhere.

(f) No single pattern. Unequal and varied developments.

2. *The Middle Ages in the West* :

(a) Advent, pressure of the Huns upon Germanic Tribes—their migration into the Western part of the Roman Empire—fall of the Empire (476 A.D)—Survival of Roman Law and Roman idea imperial unity.

(b) A short reference to Alaric, Atilla, Gaeserie.

(c) Social, political and religious life of the migrants, (a brief account only of their settlements in the imperial territories —mix-up with Roman population. Christian influence upon the settlers.

3. *The myth of 'dark age' in Europe* :

4th to 7th Century—not 'dark' learning was kept alive in monasteries—ecclesiastical concept of right and wrong functioned as a civilising influence :

4. *The Byzantine Civilisation* :

(g) Constantine founds Constantinople and makes Christianity the official religion of Byzantium.

(b) Justinian's efforts to establish unified empire (without details about wars). Justinian's Law Code, its importance; patronage of architecture and painting.

(c) Importance of Byzantium as a centre of trade and commerce, preserver of Culture (Literature, Philosophy, Science).

5. *Islam and its impact* :

(a) The Arabs—land and people. The prophet and his teachings; Factors which facilitated the spread of Islam : The Caliphs, the Arab Empire; Cordova; How Europe reacted to the achievements of Islam; Arab contributions to culture, arts and sciences, scholarship. Some scholars.

6. *Western Europe in Medieval Period* (800—1200 A.D. approx.)
   (a) Charlemagne—revival of the Holy Roman Empire (800 A. D.) Importance of Coronation – relation between State and Church—Court and its patronage of Art and Literature.
   (b) Monasteries – monks and nuns—life centring round monasteries (Benedictive vows)—the role of monasteries in the preservation and dissemination of learning Cluny (Freeing the Church from corruption, secularisation and feudalisation).
   (c) Investiture issue (Reference only)
   11th and 12th centuries : from monastic and cathedral schools Universities – some famous scholars, Students and teacher relationship. The growth of studies in Law, Medicine, Theology, as well as logic, liberal arts, literature.

7. *Feudalism in Medieval Europe* :
   (a) Feudalism : Land—the bond between man and man ; The Feudal hierachy : private assumption of public authority, the role of the Feudal Castle and mailed horsemen in saving Europe ; Feudalism—away of life ; Institution of Chivalry – Troubadours.
   (b) Manorial System : Manorialism – economie aspects of Feudalism ; Manor the local unit of Feudal Govt. Manorial Court. Economic conditions : Cultivation by labour of village community ; peasants' heavy toil and heavy rent ; conditions of peasants' life. Heavy dues to Lord and Church in cash or kind. Manorial life in Castles – Three distinct classes—clergy, nobility and the rest—nobility and peasants at opposite poles. Serf—a chattel of the Lord – obligatory service, hereditary serfdom ; Means of escape—joining a holy order, running away to town for shelter, getting employed in business and industry, Revolt.

8. *The Crusades* : (1st, 3rd, 4th)
   Motives – Impact upon society and culture – new towns and trade centres (Italy in particular), cottage industries separated from agriculture (11th & 12th centuries).

9. *Growth of Towns*—Role of Crusades—Guilds in towns—Their activities—a short account of life in towns. Town autonomy by royal charter ; origin of the term 'Bourgeois'.

10. *The Far East in the Middle Ages* :
   (i) China in Medieval Period (from early 7th Century to 14th Century).
   (a) The T'ang period (618—907 A.D.) Re-unification of China and recasting the laws : Education, learning, literature (Poetry) : Tea, printing, arts.
   Promotion of trade, commerce and agriculture. Buddhism

in China. Chinese civlisation spread to Japan, Korea, Annam. China—a model for emulation.
Hiuen Tsang's visit to India and his return—impact.

(b) The Sung period (960—1280—Important experiments—State control of Cemmerce, State loan to farmers, property, Tax.—Education and Culture.

(c) The Yuan Period (1280 -1368): The Mongols: Kublai Khan (Tibetan Buddhism), and the accouut of Marcopolo.

(ii) *Japan in Medieval period :*

(a) Society and Feudal economy in early medieval times Supremacy of Mikado: Close links with China. Resistance of "Great Families".

Mikado combined the office of Shinto High Priest and absolute sovereign. Yet the growing power of hereditary clan-families and enrichment of Buddhist Orders weakened the central authority. The Shogunate. The Samurai, Japanese Chivalry (Bushido).

12. *India in the Middle Ages* :

(a) After the Guptas (5th—7th century). Hun incursions from 458 (occupation of Persia, Kabul, North-Western India): (historical importance of the Huns).
Break up of the Gupta Empire ; Age of Harshavardhan : Shrinking of the ideal of imperial unity to only Uttara-pathanath : Hiuen Tsang's travels - his account ; Nalanda—main features of the University.

(b) *Post-Harshavardhan period* (8th to 12th century) :
After Harshavardhan—rise of smaller States : The 'Raj-puts' : The Feudal Clannish principalities of Rajputana : Pala, Pratihara, Rastrakuta contest (reference only)—un-ability to establish a united empire ; smaller kingdoms and vassals.

(c) Bengal : Sasanka, Life and Society under the Palas and Senas—Religion and learning (Vikramsila and Uddanda-pur).

(d) South India—The Chalukyas of Badami and Pallavas of Kanchi, their contributions to Art and Architecture—Maritime activities of the Cholas.

12. *India's foreign contacts :*

By land—Mahayana Buddhism in Central Asia, thence to China (Khotan ruins, Hiuen Tsan's evidence) :
Tibet,—(Atisa Dipankar).
by Sea—Settlements and cultural influence in South East Asia—Subarnabhumi—Yashodharapur and Angkorvat, Ang-korthom—Malay, Java—Barobudur.

13. *The Sultans of Delhi* (1206 to 1526 A.D.)

Coming of Turko-Afghans to India (only a brief reference to the motive and manner of their coming) ;

Main features of political, Social and economic life ; Mutual influence of Hinduism and Islam ; liberal developments in Arts and Culture, translation of classics. Bhakti Cult (the medieval Saints)—Sri Chaitanya, Nanak and Kabir.

Bengal - Social, cultural and economic conditions in Ilias Shah and Hussain Shah's periods.

Short account of the general administrative system.

14. Towards the end of the Medieval era (14th & 15th) Centuries; Fall of Constantinople : its impact on the Renaissance which had already started in the West.

* Feature of the Renaissance era—Spirit of enquiry and reasoning, widening of frontiers of knowledge, scientific discoveries based on "obsecured facts", geographical discoveries—its outcome.

* National States—France, England, Portugal, Spain, Struggle for National Freedom (Dutch).

* Expansion of Europe.

* Old Order Vs. New Order—The English revolt

Topics with asterisks should only be used as reference, as a conclusion to the old era and introducion of a new era.

সূচীপত্র

মধ্যযুগ ঃ পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী (বর্ষ ও ঘটনাপঞ্জী)

খ্রীষ্টাব্দ	ইয়োরোপ	ভারতবর্ষ	চীন ও জাপান	পশ্চিম এশিয়া
৩২৫	বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সূচনা			
৪১৩	অ্যালারিকের রোম লুণ্ঠন			
৪৫১	অ্যাটিলার ফ্রান্স আক্রমণ ও পরাজয় ইটালী আক্রমণ			
৪৫৩	অ্যাটিলার মৃত্যু			
৪৫৫-৬৭		স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল		
৪৭৬	পশ্চিম ইয়োরোপে রোমান শাসনের অবসান			
৪৮৬	গলদেশে ফ্রাংকদের রাজ্যস্থাপন			
৫২৭-৬৫	জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল			
৫৭০-৬৩২				হজরত মহম্মদ
৬২২				হিজরী সনের অরম্ভ
৬০৬-৪৭		হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল		
৬২৯-৪৩		হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ		
৬৪৫-৬৫০			জাপানের মহান সংস্কার কার্য	
৭১২-১৩		আরবদের সিন্ধুদেশ আক্রমণ ও বিজয়		
৭১৮-৯০৭			চীনে তাং বংশের রাজত্বকাল	
৭৬৮-৮১৪ ৮০০	শার্লামানের রাজত্বকাল শার্লামানের অভিষেক			
৭৮৬-৮০২				হারুন-অল-রশীদের রাজত্বকাল

খ্রীষ্টাব্দ	ইয়োরোপ	ভারতবর্ষ	চীন ও জাপান	পশ্চিম এশিয়া
৯৬০-১২৮০			চীনে সুং বংশের রাজত্বকাল	
৯৯৮-১০৩০		সুলতান মামুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ		
১০৯৫	ক্রুসেডের আরম্ভ			
১০৯৯	ক্রুসেডারদের জেরুজালেম বিজয়			
১১৭৫-১২০৬		মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান		
১১৮৭	সালাদিন কর্তৃক জেরুজালেম পুনরধিকার			
১১৮৯-৯৩	বারবারোসা রিচার্ড ও ফিলিপ অগাস্টাসের ক্রুসেড			
১২০৬		দাস বংশের প্রতিষ্ঠা		
১২৮০-৬৮			চীনে ইউয়ান যুগ	
১২৮০-১২৯৪			কুবলাই খাঁর শাসনকাল	
১২৯৬-১৩১৬		আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকাল		
১৩২৫-৫২		মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল		
১৩৫১-৮৮		ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকাল		
১৪৫৩	বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অবসান			
১৪৯৩		বঙ্গদেশে হুসেন শাহের সিংহাসন আরোহণ		

প্রথম পরিচ্ছেদ

"মধ্যযুগ" কথাটির অর্থ এবং এই যুগের স্থিতিকাল ঃ যুগ যুগ ধরে মানুষের ইতিহাস নদীর স্রোতের মত বয়ে চলেছে। ইতিহাসের যুগবিভাগ কোনও ঘটনা নয়। নূতন যুগের সূচনা হয় পুরাতন যুগের মধ্যেই। ইতিহাস পড়া ও পড়ানোর সুবিধার জন্য এবং মানুষের ক্রমবিকাশের গতি ও প্রকৃতির প্রকৃত ধারণা লাভের জন্য ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এর এক-একটি ভাগকে বলা হয় যুগ। যুগ তিনটি হল—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। প্রত্যেকটি যুগের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকরা 'মধ্যযুগ' কথাটি ব্যবহার করেছেন কতকগুলি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার পটভূমিকায় ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট যুগকে বর্ণনা করার জন্য।

মধ্যযুগের সূচনা হয় যখন ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। এই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে যখন জার্মান উপজাতিদের হাতে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। আবার কারো কারো মতে ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপে মার্টিন লুথারের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাতে মধ্যযুগের অবসান ও নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারকে নূতন যুগের সূত্রপাত বলেছেন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে মধ্যযুগের আরম্ভ হয়েছে বলে মনে করেন। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল—কৃষ্টির ধারকরূপে সমগ্র ইউরোপের আবির্ভাব, পোপের কর্তৃত্বের উত্থান ও পতন এবং 'সামন্ততন্ত্র' নামে সমাজ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব। মধ্যযুগ খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। এই সময় রেনেসাঁস বা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান কৃষ্টি এবং শিক্ষার পুনর্জাগরণ ইউরোপে "আধুনিক যুগ"-এর পদার্পণ ঘটায়। নগরকেন্দ্রিক সমাজ, ছাপাখানার আবিষ্কার, নূতন নূতন দেশের আবিষ্কার এবং ধর্ম থেকে রাজনীতির অপসারণের পর পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাস নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার পতনের মধ্য দিয়েই এক নূতন যুগের সূত্রপাত হল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে গুপ্তযুগের শেষভাগ থেকে মধ্যযুগের সূচনা : ভারতে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল গুপ্তযুগের পতনের পর—আনুমানিক ৫৫০ খ্রীস্টাব্দে। রোমান সাম্রাজ্যের মত গুপ্তযুগেরও পতনের কারণ ছিল আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ। মধ্য এশিয়ার এক নিষ্ঠুর ও দুর্ধর্ষ হূণ জাতি কেবল রোমান সাম্রাজ্যের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলগুলিই আক্রমণ করেনি, ভারতে গুপ্ত নরপতিদের কেন্দ্রীয়শক্তির পতনের পর তারা গুপ্ত সাম্রাজ্যও আক্রমণ করেছিল। ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অভাব ছিল ; তাই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিল। গুপ্তদের পতন থেকে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হর্ষবর্ধনের অভ্যুত্থান পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক চিত্র ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এই সময় ভারতবর্ষ কতকগুলি আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত ছিল। উত্তর ভারত চারটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্য চারটি ছিল—মগধের পরবর্তী গুপ্ত নরপতিগণ, মৌখরীগণ, পুষ্যভূতিগণ এবং মৈত্রকগণ শাসিত রাজ্য। পুষ্যভূতিবংশীয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের অধীনে উত্তর ভারত কিছুকালের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে হর্ষের মৃত্যুর পর থেকে ৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারত আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ এবং বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কনৌজের সিংহাসন প্রতিহারদের হস্তগত হল। এঁরা কনৌজে ১০১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতে মধ্যযুগের অবসান হয়।

এদিকে ইউরোপে রোমের পতন এবং অন্যদিকে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন অন্ধকার যুগের সূচনা করেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতবর্ষে ছিল না। মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্ম একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ভারতীয় রাজনীতিতে মধ্যযুগে ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে ছিল না বললেও চলে ; ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। সামন্ততন্ত্রের রাজনৈতিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্য ভারতে ছিল। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে নগদ অর্থে বেতন না দিয়ে কর্মচারীদের জমি দান করার প্রথা সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিকেই শক্তিশালী করেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাসে যুগবিভাগের সার্থকতা ঃ ইতিহাসকে কোনও নির্দিষ্ট ছকে ফেলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট যুগে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি এক রকম ছিল না। কারণ, দেখা যায় এক যুগের অবসান ও অপর যুগের সূচনা একই সময়ে সবদেশে আরম্ভ হয় নি। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে যুগ-পরিবর্তন ঘটেছে। 'অন্ধকার' যুগে পশ্চিম ইউরোপে গ্রীস ও রোমান সংস্কৃতি লোপ পেলেও পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এই সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের যথার্থ সূচনা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। যদিও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীকে মধ্যযুগের সূচনারূপে এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীকে এই যুগের সমাপ্তিরূপে ধরা হয়ে থাকে, তবুও প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পৃথিবীর সর্বত্র মধ্যযুগের অবসান সূচিত করে না। ইউরোপে আধুনিক যুগ রেনেসাঁস ও রিফরমেশন আন্দোলন (খ্রীস্টান ধর্মাধিষ্ঠানকে পবিত্র করার আন্দোলন) থেকে আরম্ভ হলেও ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। চীনদেশে মধ্যযুগের স্থিতিকাল ছিল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যখন সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাপানে মধ্যযুগের স্থিতিকাল ছিল ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন থেকে সম্রাট মুৎসুহিতো নিজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। আফ্রিকার বিরাট অংশে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়নি। সুতরাং ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট যুগে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সবদেশে সমান কার্যকর হতে দেখা যায় না। মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাব, বিভিন্ন ঘটনা মানুষের জীবনকে নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে। এসব সত্ত্বেও ঐতিহাসিকদের যুগবিভাগের সার্থকতা ইতিহাস পাঠে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাসে যুগ-বিভাগের প্রয়োজন হয় কেন ?
২। ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে ক'ভাগে ভাগ করেছেন ?
৩। 'মধ্যযুগ' কথাটির ব্যবহার ঐতিহাসিকরা করেছেন কেন ?
৪। মধ্যযুগের সূচনা কখন হয়েছিল ?

৫। মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল কখন ?
৬। ভারতে মধ্যযুগের সূচনা কখন হয়েছিল ?
৭। চীনে মধ্যযুগের কখন অবসান হয় ?
৮। জাপানে মধ্যযুগের অবসান কখন হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'মধ্যযুগ' কথাটির অর্থ কি ?
২। মধ্যযুগের স্থিতিকাল সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৩। ভারতে মধ্যযুগের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক বিবরণ দাও।
৪। ইতিহাসে যুগবিভাগের সার্থকতা আছে কি ?
৫। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'মধ্যযুগ' বলতে কি বোঝায়। এই যুগ কত কাল স্থায়ী ছিল ?
২। ভারতের মধ্যযুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ভারত ও ইউরোপে মধ্যযুগের সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি আলোচনা কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল—খ্রীস্টাব্দে।
২। —মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাতে মধ্যযুগের অবসান ও নূতন যুগের আবির্ভাব হয়।
৩। —খ্রীস্টাব্দে মুঘল সামাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতে মধ্যযুগের অবসান হয়।
৪। —খ্রীস্টাব্দে হর্ষের মৃত্যু হয়।

মৌখিক প্রশ্নাবলী

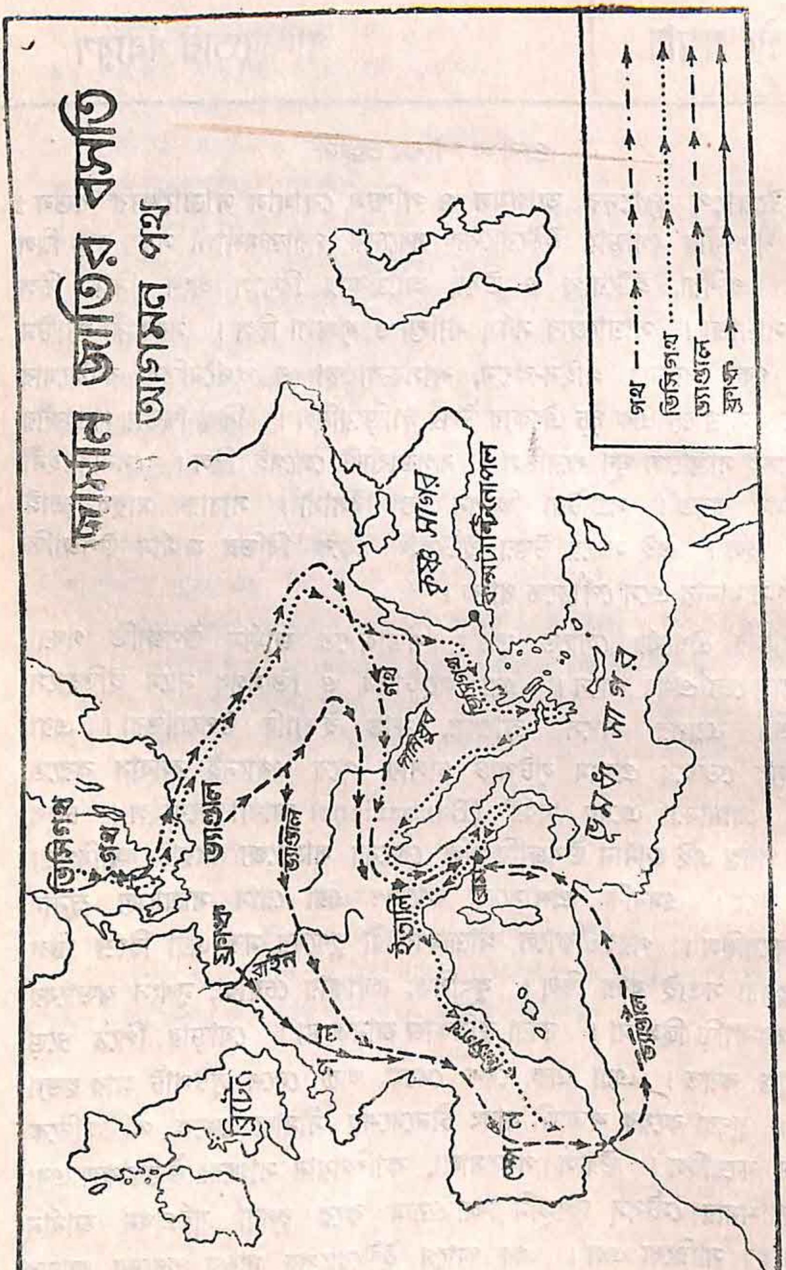
১। মার্টিন লুথার কে ছিলেন ?
২। কলম্বাস কত খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন ?
৩। গুপ্তবংশের পতনের পর উত্তর ভারতের চারটি প্রধান রাজ্যের নাম কর।
৪। আফ্রিকায় আধুনিক যুগ কখন আরম্ভ হয়েছিল ?

দ্বিতীয় অধ্যায় | পাশ্চাত্যের মধ্যযুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপে হূণদের আগমন ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন : পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় ইউরোপের সবচেয়ে পরাক্রমশালী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ছিল রোম। এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার বিশাল অংশ নিয়ে ছিল রোম সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। সরকারী ল্যাটিন ভাষা, একই ধরনের আইন-কনুন, শাসন-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে সাম্রাজ্য এক দৃঢ় ঐক্যের উপর দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়াতেই সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরেছিল। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল। সেনাবাহিনী দেশশাসন করত। সম্রাটরা ছিলেন ভোগবিলাসী। সাধারণ মানুষ তাই অসন্তুষ্ট ছিল। এই সময়ে উত্তর ইউরোপ থেকে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি রাজ্যের সীমানায় এসে পেঁীছতে থাকে।

রোমের ঐশ্বর্যের লোভে তৃতীয় শতাব্দীতে জার্মান উপজাতি গথরা রোম সাম্রাজ্যে প্রথম আসে। এরা অস্ট্রোগথ ও ভিসিগথ নামে ইতিহাসে পরিচিত। এরপর আসে ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক ইত্যাদি উপজাতিরা। এরা সাম্রাজ্যের ভেতরে প্রথমে লুটপাট চালায়, পরে এখানেই বসবাস করতে থাকে। রোমানরা এদের 'বর্বর' (Barbarians) আখ্যা দিয়েছিল। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই জার্মান উপজাতিগুলি রোমের সাম্রাজ্যে বিরাট আধিপত্য বিস্তার করে। এমনকি প্রশাসনের কাজেও এরা রোম সাম্রাজ্যে সুনাম অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে আক্রমণকারী হূণদের মত এরা হিংস্র ছিল না। হূণরা সত্যই বর্বর ছিল। কুৎসিত, কদাকার চেহারা, নৃশংস স্বভাবের হূণদের ঘর-বাড়ি ছিল না। তারা কৃষিকাজ জানত না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা যুদ্ধ করত। এরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে লুটপাট আর হত্যা চালাত। হূণরা কয়েক শতাব্দী যাবৎ চীনদেশের সীমান্ত থেকে পশ্চিমদিকে অভিযান করেছিল। উরাল পর্বতমালা, কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ রাশিয়ার স্টেপস্ তৃণভূমি অতিক্রম করে হূণরা সর্বপ্রথম জার্মান জাতিসমূহের সান্নিধ্যে এল। এর আগে ইউরোপের মানুষ হূণদের জানত না। বেশীর ভাগ হূণ খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আগে ইউরোপে আসে নি। হিংস্র ও নিষ্ঠুর হূণ জাতির নির্মম অত্যাচারে সাহসী রোমান ও যুদ্ধপ্রিয়


জার্মান জাতির বসতি
আগমন পথ
গথ
ভিজিগথ
ভ্যান্ডাল
ফ্রাঙ্ক
কৃষ্ণ সাগর
কনস্টান্টিনোপল
ভূমধ্য সাগর
ইতালি
রোম
ব্রিটেন
ফ্রান্স
রাইন
ভ্যান্ডাল
ভিজিগথ

জার্মান জাতিও অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। ঘোড়ার পিঠেই তাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হত—ঘোড়ার পিঠেই তারা বেচা-কেনা এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করত। হূণরা অতর্কিতে এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জার্মানদের আক্রমণ করে ভীতিবিহ্বল করে তুলেছিল।

হূণরা সর্বপ্রথম কৃষ্ণসাগরের উত্তরাঞ্চলে অস্ট্রোগথদের আক্রমণ করে। তারপর তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমান হাঙ্গেরীর থেইস নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলে হূণরা প্রায় পঁচাত্তর বছর রাজত্ব করেছিল। হূণরা পূর্বাঞ্চলের সম্রাটদের কাছ থেকে বাৎসরিক কর আদায় করত। তাদের সঙ্গে পূর্ব রোমার সম্রাজ্যের রাজ্যগুলির এবং পশ্চিমাঞ্চলের সম্রাটদের যোগাযোগ ছিল। এই পঁচাত্তর বছর হূণরা জার্মান জাতিগুলির রীতিনীতিগুলি আয়ত্ত করেই ক্ষান্ত হল না, তারা রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাকে নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিল।

৪৭৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলেই জার্মান জাতিগুলি ছয়টি বড় টিউটন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি তাদের আগেকার মিলেমিশে থাকার কথা ভুলে গেল, এর ফলে ইউরোপে অজ্ঞানতা ও বর্বরতা নেমে এল। জার্মান উপজাতিগুলির অনুপ্রবেশ ইউরোপে ভাষা ও রীতিনীতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করল। রোমান সাম্রাজ্যের সব কিছুরই অবসান হল, কেবল রোমান ধর্মাধিষ্ঠান ও আইনবিধি বেঁচে রইল। বর্বর জাতিগুলি রোমানদের কাছ থেকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্য খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হল সত্য কিন্তু রোমান ধর্মাধিষ্ঠান জনগণের বিশ্বাস, শৃঙ্খলা, ন্যায়বোধ ও মিলেমিশে এক হয়ে থাকার উদাহরণ হয়ে রইল। বর্বর জাতিগুলি রোমানদের জয় করলেও তারা কখনই রোমের ভাবধারা ও রীতিনীতিগুলিকে বদলাতে পারেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অ্যালারিক, অ্যাটিলা ও গেইসেরিকের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী

অ্যালারিক: অ্যালারিক ছিলেন ভিসিগথদের নেতা; পরে তিনি ভিসিগথদের প্রথম রাজারূপে নির্বাচিত হন। দুর্ধর্ষ হূণরা যখন অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে ইউরোপের সর্বত্র অভিযান করছিল তখন চারদিকে ত্রাসের সঞ্চার হল। হূণদের আক্রমণের ভয়ে ভিসিগথরা রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করল। ভিসিগথরা অসভ্য ছিল না, তবে তাদের দলপতি অ্যালারিক

ছিলেন বর্বর প্রকৃতির। ভিসিগথরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। অ্যালারিক তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রোমান সম্রাট থিয়োডসিয়াসের অধীনে চাকুরি নিয়েছিলেন। অ্যালারিক তিনবার রোমে অভিযান করেন। এরপর ভিসিগথরা তাদের প্রথম অভিযানে (৪১০ খ্রীস্টাব্দে) অনেক সোনা, রূপা, রেশম ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে রোমের বিরুদ্ধে অবরোধ তুলে নেয়। শেষ পর্যন্ত অ্যালারিক রোম শহরে আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেয়। এর কিছুকাল পরই রোম সাম্রাজ্যের অবসান হয়। কিন্তু ভিসিগথরা রোমে বসতি স্থাপন করল না। উত্তর আফ্রিকার শস্যক্ষেত্র অঞ্চলে বসবাসের জন্য তারা ইতালি থেকে জলপথে যাত্রা শুরু করল। মেসিনাতে ঝড়ের প্রকোপে পড়ে তাদের অধিকাংশ জাহাজ ধ্বংস হল। এই ঘটনার এক বছর পরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অ্যালারিকের মৃত্যু হল।

অ্যাটিলা ঃ হূণদের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন অ্যাটিলা। অ্যাটিলার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া থেকে ইউরোপের রাইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন। দয়ামায়া কাকে বলে তিনি জানতেন না। কৃষ্ণসাগর থেকে বল্কান উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল চরম নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার চালিয়ে তিনি অধিকার করেন। অ্যাটিলা কন্‌স্ট্যানটিনোপল শহর আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সম্রাট থিয়োডসিয়াস তাঁকে প্রচুর ঘুষ দিয়ে নিরস্ত করেছিলেন। অ্যাটিলা গল দেশ (বর্তমান ফ্রান্স) আক্রমণ করেন। এখানে রোমান, ফ্রাঙ্ক, গথ ও অন্যান্য জার্মান জাতি একত্রে অ্যাটিলাকে বাধা দেয়। এই যুদ্ধে অ্যাটিলা পরাজিত হন। কিছুকাল পরেই নিজশক্তি পুনরুদ্ধার করে তিনি রোম নগরীর দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন। স্বয়ং ধর্মগুরু পোপ তখন অ্যাটিলাকে রোম নগরী রক্ষার আবেদন জানান। রোম নগরী ধ্বংস না করে সেখান থেকে প্রচুর ধনরত্ন লুট করে অ্যাটিলা ফিরে যান। কিছুকাল পর অ্যাটিলার মৃত্যু হয়।

গেইসেরিক ঃ ভ্যাণ্ডালরা প্রথমে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্পেনে প্রায় তেইশ বছর (৪০৬-৪২৯ খ্রীঃ) বসবাস করেছিল। এরপর তারা উত্তর আফ্রিকায় চলে আসে। গেইসেরিক ছিলেন আফ্রিকার প্রথম ভ্যাণ্ডাল নরপতি। দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের শাসনকালের মধ্যে গেইসেরিক কেবলমাত্র আফ্রিকার বিশাল ভূ-খণ্ডের উপরই তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন নি, শক্তিশালী এক নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে কেউ ক্যাথলিক ধর্মের যাজক হতে পারত না।

৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে রোম সম্রাট তৃতীয় ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুর পর গেইসেরিক তাঁব ভ্যাণ্ডাল-বাহিনী নিয়ে রোম নগরী লুণ্ঠন করেন। এর আগে ৪৩৯ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপোলী থেকে কার্থেজ পর্যন্ত অঞ্চলে গেইসেরিক ব্যাপক অভিযান করেন। ৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে চরম অত্যাচারী এই ভ্যাণ্ডাল নরপতির মৃত্যু হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জার্মান জাতিসমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা—রোমান জাতিগুলির সঙ্গে তাদের মিশ্রণ—আক্রমণকারীদের উপর খ্রীস্টধর্মের প্রভাবঃ ট্যাসিটাসের 'জার্মানিয়া' এবং জুলিয়াস সীজারের 'কমেণ্টারিস' গ্রন্থ দুটি থেকে জার্মান জাতিসমূহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ট্যাসিটাস 'জার্মানিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, জার্মান জাতিগুলির বাস ছিল রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে, মধ্য ইউরোপের গহন অরণ্য ও বিস্তির্ণ জলাভূমিতে। এই অঞ্চলে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদিত হত এবং অঞ্চলটি গভীর অরণ্যে ঘেরা ছিল। শিক্ষাদীক্ষা ও কৃষ্টিতে উন্নত রোমান জাতি অবজ্ঞা করে জার্মান জাতিগুলিকে 'বার্বেরিয়ান' বা বর্বর আখ্যা দিয়েছিল।

জার্মানদের চেহারা সম্বন্ধে ট্যাসিটাস লিখেছেন—তাদের "নীল চোখ, লাল চুল ও দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর" ছিল। রোমানরা শহরে বাস করলেও জার্মানরা গ্রামে বাস করত। শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্য গ্রামগুলি কাঠের এবড়ো-থেবড়ো মোটা খুঁটি দিয়ে ঘিরে রাখা হত। খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরগুলির দেওয়াল প্রথমে কাঠের বেড়া দিয়ে তৈরি করে তার উপর কাদা মাটি লেপে দেওয়া হত।

প্রথম যুগে জার্মান পুরুষদের উপজীবিকা ছিল মৎস্য ও পশু শিকার। তারপর তারা কৃষি ও পশুপালনে রপ্ত হয়েছিল। জার্মান পুরুষরা লম্বা জামা পরত। মেয়েরা ডোরা কাটা জামা পরত। ওই জামা সাধারণত শণের সুতো দিয়ে তৈরি হত। পুরুষরা সাধারণত একবারই বিবাহ করত। ধনী ব্যক্তিরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত। পুরুষরা অবসর সময়ে শিকার করত, জুয়া খেলত অথবা বাজি রেখে রথ চালনা করত। জার্মান নারীরা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত থাকত। তাদের সাহস ছিল অতুলনীয়; তারা সর্বদাই পুরুষদের সাহস যোগাত।

জার্মানরা ছিল খুব যুদ্ধপ্রিয় জাতি। যুদ্ধে তারা চামড়ার ঢাল ও শিরস্ত্রাণ ছাড়া বর্শা, কুঠার ও তরবারি ব্যবহার করত। তারা সাধারণত ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। যুদ্ধের সময় মেয়েরাও পুরুষদের সব রকম উৎসাহ দিত।

জার্মান সমাজের মানুষ তিন শ্রেণীর ছিল—অভিজাত, স্বাধীন প্রজা ও দাস। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমস্ত দেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। নিম্নতম বিভাগ ছিল গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি 'হাণ্ড্রেড' বা "শতপল্লী" গঠিত হত। একশ' হাণ্ড্রেড বা শতপল্লী নিয়ে 'ক্যান্টন' বা 'গাউ' গঠিত হত। কয়েকটি 'ক্যান্টন' নিয়ে একটি জাতির দেশ গঠিত হত। রাজতন্ত্রের প্রচলনের পর একই জাতির লোকদের বাসভূমি 'রেইখ' নামে পরিচিত হল।

রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জার্মান জাতিসমূহের উপনিবেশগুলি গড়ে ওঠার সময় বহু দেবদেবীর উত্থান ও পতন হয়েছিল। জার্মানদের দেবদেবীদের মধ্যে 'ওডিন,' 'ফ্রিগা', 'টুই', 'থর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জার্মান জাতিগুলি পরে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের মধ্যে গথরাই সর্বপ্রথম খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। পৌত্তলিক জার্মান জাতিগুলির বহু দেবতারা খ্রীস্টধর্মে ঠাঁই পেয়েছিল।

ইউরোপের উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জমি ও জলবায়ু অনেক ভাল। জুলিয়াস সীজারের শাসনকালের বহু আগে থেকেই জার্মানরা রাইন নদীর বামতীরের অঞ্চলগুলিতে উপনীত হয়। সীজার ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই ব্যাপারে জার্মানদের উৎসাহ দিতেন। যে সব অঞ্চলে জার্মান জাতিসমূহ এসেছিল সেই সব অঞ্চলের রোমানদের সঙ্গে বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক আদান-প্রদান ঘটল। ফলে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে রোমান, কেল্ট-ও জার্মান জাতিগুলির মধ্যে আর কোন বিভেদ রইল না।

অনুশীলনী

বাস্তবীভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'গথ'রা রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল কেন ?
২। রোমানরা কাদের 'বর্বর' অ্যাখ্যা দিয়েছিল ?
৩। কোন্ গ্রন্থ থেকে আমরা জার্মান উপজাতিদের সম্বন্ধে জানতে পারি ?
৪। যে সব উপজাতি রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল তাদের নাম উল্লেখ কর।
৫। হূণদের আদিম বাস কোথায় ছিল ?
৬। পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ?
৭। ভিসিগথদের প্রথম নির্বাচিত রাজা কে ছিলেন ?
৮। হূণদের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন ?
৯। ভ্যান্ডালদের একজন রাজার নাম কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরকম ছিল ?
২। হূণদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে যা জান লিখ ।
৩। হাঙ্গেরী অঞ্চলে হূণদের শাসন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪। রোম সাম্রাজ্যে জার্মান জাতিগুলির অনুপ্রবেশের প্রভাব আলোচনা কর ।
৫। ভিসিগথদের রোম অভিযান সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬। অ্যাটিলার গল দেশ আক্রমণ সম্বন্ধে যা জান লেখ ।
৭। জার্মান জাতিগুলি কি রকম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল ?
৮। জার্মানদের সমরপ্রিয়তা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৯। জার্মানদের রাজনৈতিক বিভাগগুলি সম্বন্ধে আলোচলা কর।
১০। জার্মানদের ধর্মীয় অবস্থা কিরূপ ছিল ?
১১। ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিভিন্ন জাতিসমূহের মিশ্রণ কিরূপে হয়েছিল ? তার ফল কি হয়েছিল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি ?
২। অ্যালারিকের কার্যাবলী সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৩। অ্যাটিলার বিজয় সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৪। গেইসেরিক কে ছিলেন ? আফ্রিকায় গেইসেরিকের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
৫। র্জামানদের চেহারা, উপজীবিকা, খাদ্য, বস্ত্র ও আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সঠিক উত্তরের পাশে '√' দাও

১। রোম সাম্রাজ্য সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছিল হূণরা/গথরা/ ভ্যান্ডালরা।
২। হূণদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন গেইসেরিক/অ্যাটিলা/অ্যালারিক।
৩। আফ্রিকার প্রথম ভ্যান্ডাল নরপতি ছিলেন তৃতীয় ভ্যালেন্টাইন/অ্যালারিক/ গেইসেরিক।

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। অ্যালারিক কোন্ রোম সম্রাটের অধীনে চাকুরি নিয়েছিলেন ?
২। কার রাজ্যে কেউ ক্যাথলিক ধর্মের যাজক হতে পারত না ?
৩। প্রথম যুগে জার্মান পুরুষদের উপজীবিকা কি ছিল ?
৪। 'হান্ড্রেড' কাকে বলা হয় ?
৫। 'ক্যান্টন' কি ?
৬। কয়েকটি জার্মান দেবদেবীর নাম কর।

———

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে'র অবাস্তব কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ ঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকেই রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। জার্মান উপজাতিদের এই দুর্বল সাম্রাজ্যের উপর ক্রমাগত আক্রমণ, লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংসলীলার ফলে অবশেষে ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের ক্রমিক পতন এবং জার্মান উপজাতিসমূহের উপনিবেশ স্থাপন ও আক্রমণের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতা বিপর্যস্ত হল। জার্মান আক্রমণের ফলে বহু মূল্যবান শিল্পের নিদর্শন নষ্ট হল, বিদ্যা-চর্চার কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হল। রাজতন্ত্রের ধ্বংস হওয়ায় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষতি হল, শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হল। রোম, পাদুয়া, মিলান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়ায় সভ্যতার অনেক নিদর্শন লুপ্ত হল। রাজনৈতিক অরাজকতা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোমান যুগের সুফলকে অনেকাংশে নষ্ট করে ফেলে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়। কিন্তু ল্যাটিন সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধর্মাধিষ্ঠানগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। মঠ-মন্দিরের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপটিকে সযত্নে প্রজ্বলিত রেখে অজ্ঞানের অন্ধকারকে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছিল। ধর্মাধিষ্ঠান তার গৌরবময় ঐতিহ্য, অপূর্ব সংগঠন, অপরিমেয় সম্পদ এবং অসাধারণ সামর্থ্যের ফলে প্রকৃত মেধাবী তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল এবং কৃষ্টির উপাদানগুলি সৃষ্টি করতে অথবা এই সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু চার্চ বা ধর্মাধিষ্ঠান তার কর্তব্য নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করল। ধর্মাধিষ্ঠান অল্প সময়ের মধ্যেই আদিম কৃষক সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় নিজেও কিছুটা বর্বর হয়ে পড়েছিল। খ্রীস্টান ধর্মাধিষ্ঠান রোমান অথবা জার্মান পৌত্তলিকতার সংস্কার করবার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। খ্রীস্টানদের মধ্যে এখনও কিছু অংশ পৌত্তলিক আছেন। ঐতিহাসিকদের এক অংশ এইসব কারণে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে ইউরোপের 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' যুগ বলেন। খ্রীস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীস্টান ধর্মাধিষ্ঠান পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা বিকাশে সহায় হয়েছিল এবং কৃষ্টির প্রসার ঘটিয়েছিল। এইদিক থেকে বিচার করলে এই যুগটিকে "অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ" আখ্যা দেওয়া হলেও এ যুক্তি যথার্থ নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চার্চে শিক্ষাদীক্ষার অবিরাম চর্চা ঃ জার্মান ফ্রাঙ্ক উপজাতির নেতা ক্লভিস (৪৮১-৫১১ খ্রীঃ) ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছু অংশ নিয়ে একটি রাজ্য গঠন করেন। প্যারিসে তাঁর রাজধানী ছিল।

ক্লভিসের মৃত্যুর পর রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে একজন রাজকর্মচারী পিপিনের নেতৃত্বে (৬৮৭ খ্রীঃ) ফ্রাঙ্করা আবার ঐক্যবদ্ধ হল। পিপিনের পুত্র মাটেল অষ্টম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কদের রাজা হল। মাটেলের পৌত্র মহামতি চার্লস বা শার্লাম্যানের আগেকার ফ্রাঙ্ক রাজারা এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে বিদ্যাশিক্ষাকে সম্মান জানাতে হবে।

মধ্যযুগের ইউরোপে শ্রেষ্ঠ খ্রীস্টান নরপতি হিসাবে শার্লাম্যান এই আদেশ জারী করেছিলেন যে রাজ্যের সর্বত্র চার্চগুলিতে লেখাপড়ার চর্চা রাখতে হবে এবং সাধু ও সন্ন্যাসীরা যে কেবল চরিত্রের দিক থেকেই আদর্শ হবেন তা নয় যে ভাষায় তাঁরা কথাবার্তা বলেন তাতেও তাঁদের পণ্ডিত হতে হবে। মহামতি শার্লাম্যানের রাজত্বকালের আগে থেকেই লেখাপড়ার ভিত্তি ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যুগে যে সব সাধু শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সেন্ট বেনেডিক্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মঠের আবাসিকদের জন্য যে কর্মসূচী তৈরি করেছিলেন তাতে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা পড়াশুনার জন্য নির্ধারিত ছিল। তবে তাঁদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছিল মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করে। ল্যাটিন ভাষায় বাইবেলের একটি সংস্করণ ইতঃপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সর্বত্র রোমান চার্চের ঐতিহ্যের উপযোগী ধর্মীয় গ্রন্থগুলি পুনর্লিখিত হল। এই যুগের মঠবাসী মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বেনেডিক্টের ভাই ক্যাসিওডোরাস। তাঁর উদ্যোগে অঙ্ক, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে লেখা বহু গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর রচিত বিশ্বকোষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন যেখানে ধর্মপুস্তক ছাড়াও গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের বহু মূল্যবান পুস্তক সংগৃহীত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পোপ গ্রেগরীর (৫০৯-৬০৪ খ্রীঃ) উপদেশ সম্বলিত বই রোম থেকে এনে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র প্রচার করা হল। ইনি ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাসও রচনা করেন। তিনি বর্ণনা শক্তিতে এতই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন যে, যেজন্য তাঁকে 'বর্বরদের হেরোডোটাস' বলা হত। সঙ্ঘারাম বা মঠ

বা চার্চগুলিকে সংস্কার করা হল এবং সেন্ট বেনেডিক্টের নিয়মকানুন সাধুদের পালনীয় সাধারণ নিয়মরূপে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র গৃহীত হল।

ধর্মীয় শিক্ষার গণ্ডীর বাইরে সাধারণ শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তথাকথিত অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেই 'ক্যারোলিঞ্জিয়ান মিনিসকুল' নামে সুন্দর ও পরিষ্কার এক ধরনের হাতের লেখার উদ্ভব হয়। ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সর্বত্র লেখকরা অতি দ্রুত এই হাতের লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই ধরনের হাতের লেখায় অগণিত মঠের লিপিকারগণ কেবলমাত্র বাইবেল, খ্রীস্টের উপদেশাবলী, আধ্যাত্মিক অন্যান্য গ্রন্থ ও খ্রীস্টান পঞ্জিকাই লেখেন নি, ভার্জিল ও অন্যান্য ল্যাটিন পণ্ডিতদের রচনাও এইভাবে রচিত হয়েছিল। এই যুগের পণ্ডিতরাই ভার্জিল ও অন্যান্য ল্যাটিন গ্রন্থকারের রচনা নকল করে রেখেছিলেন।

ফ্রাঙ্ক নরপতিদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফলেই উপরিউক্ত কৃষ্টি সংক্রান্ত কাজগুলি সম্ভব হয়েছিল। ফ্রাঙ্ক নরপতিদের একটা বিভাগ হিসাবে গলদেশের চার্চগুলি শাসিত হতে থাকে। এই দেশের চার্চগুলিকে তাঁরা নিজেদের ধর্মাধিষ্ঠানরূপে গণ্য করতে থাকেন। মহামতি গ্রেগরী যখন এই ধর্মাধিষ্ঠানের উপর পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন, তখন থেকেই গলদেশের যাজকদের মধ্যে বিদ্যা-চর্চার আগ্রহ খুব বেশি দেখা গিয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সভ্যতা বিকাশে ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের ভালমন্দের চেতনার প্রভাব: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চার্চের ধর্মীয় যাজকগণ ছিলেন গুণশীল ও ধর্মপ্রবণ। পোপ প্রথম গ্রেগরী ইউরোপের সমস্ত দেশের উপর রোমের চার্চের প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। মহামতি গ্রেগরী 'Regula Pastoralis' (রেগুলা প্যাস্টোরালিস) গ্রন্থে জনসাধারণের প্রতি যাজকদের কর্তব্য সম্বলিত এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

খ্রীস্টধর্মের প্রচারকরা এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে যাঁরা দান-ধ্যান, সৎ কাজ, পরোপকার, জনসেবা প্রভৃতি পুণ্যকাজে নিয়োজিত থাকবেন তাঁরা মৃত্যুর পর লাভ করবেন পরম গতি, ভোগ করবেন অনাবিল আনন্দ। যাঁরা মিথ্যা ছলচাতুরী, স্বার্থপরায়ণতা এবং অন্যায় আচরণে প্রশ্রয় দেবেন তাঁদের ভাগ্যে জুটবে নরক যন্ত্রণা।

গ্রেগরী প্রচার করলেন—যাজক হবেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায়ের বিশ্বস্ত অনুচর। যাজকদের ভালমন্দের চেতনা যে ফ্রাঙ্ক রাজ্যে

সভ্যতা বিকাশে সাহায্য করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অক্ষম, দুঃস্থ, বৃদ্ধ এবং অসহায় ব্যক্তিদের যাজকীয় কোষাগার থেকে ইউরোপের সর্বত্র সাহায্য পাঠাতে গ্রেগরী নির্দেশ দিয়েছিলেন। গ্রেগরী স্বয়ং 'ভগবানের সেবকদের সেবক' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। গ্রেগরী বিবেচনা করলেন, বর্বর জাতিসমূহকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা তাঁর প্রধান কর্তব্য।

প্রধানতঃ চার্চকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। চার্চের প্রতিষ্ঠিত নানা মঠ ও সঙ্ঘারামে খ্রীস্টান যাজকরা বিদ্যাচর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। সে যুগে সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সবকিছুই চার্চকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। বাইবেলই ছিল একমাত্র ধর্মগ্রন্থ। একটা বিশ্বাস ও গোঁড়ামি তখন খ্রীস্টধর্মীদের জীবনে দৃঢ় ছিল। তবে রোমান সমাজে যে দুর্নীতি ও অত্যাচার চলছিল চার্চের ভালো কাজের ফলে সেগুলি অনেকখানি দূর হয়েছিল। চার্চের প্রভাবে অশান্ত ও দুর্ধর্ষ জার্মানরাও ক্রমে শান্তিপ্রিয় হয়। দুর্ধর্ষ ভিসিগথ নেতা অ্যালারিক পোপের কথায় রোম লুণ্ঠন করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

অনুশীলনী

বাস্তবীভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' কোন্‌টিকে বলা হয় ?
২। কোন্ কোন্ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল ?
৩। ল্যাটিন সংস্কৃতির ঐতিহ্য কে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল ?
৪। 'ক্যারোলিঞ্জিয়ান মিনিস্‌কুল' কি ?
৫। গলদেশে বিদ্যাচর্চার আগ্রহ কখন খুব বেশী দেখা গিয়েছিল ?
৬। সেন্ট বেনেডিক্ট কে ছিলেন ?
৭। পোপ গ্রেগরী কে ছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ফ্রাংক নরপতিরা কিভাবে বিদ্যাচর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন ?
২। চার্চে কিভাবে শিক্ষা-দীক্ষার অবিরাম চর্চা হত ?
৩। শিক্ষাপ্রচারে সেন্ট বেনেডিক্টের অবদান আলোচনা কর।
৪। 'অন্ধকার যুগে, ক্যাসিওডোরাসের অবদান কি ?
৫। ধর্মাধিষ্ঠানসমূহ সভ্যতা বিকাশে ভালমন্দের চেতনার প্রসার কিভাবে ঘটিয়েছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। পিপিনের পুত্র—অষ্টম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কদের রাজা হন।
২। —ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস রচনা করেছিলেন।
৩। —স্বয়ং 'ভগবানের সেবকদের সেবক' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।
৪। দুর্ধর্ষ ভিসিগথ নেতা অ্যালারিক—রোম লুণ্ঠন করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'ঐতিহাসিকদের একাংশ খ্রীস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যুগকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' আখ্যা দিলেও যুগটি প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার ছিল না।'—প্রমাণ কর।
২। 'অন্ধকার যুগে' শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্ক নরপতিদের ও মঠবাসী মনীষীদের অবদান আলোচনা কর।

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। ক্লভিস কে?
২। পিপিন কে?
৩। মার্টেল কে?
৪। ক্যাসিওডোরাস কে?
৫। Regula Pastoralis' কি?
৬। 'বর্বরদের হেরোডাটাস' কাকে বলা হত?

চতুর্থ অধ্যায় | বাইজান্টিয়ামের সভ্যতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের কন্‌স্টানটিনোপল নগর প্রতিষ্ঠা : ৩০৬ খ্রীস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর কন্‌স্টানটাইন রোমের সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত হলেন। ঐ সময় দুজন সম্রাট রোমান সাম্রাজ্য শাসন করতেন। তখন কন্‌স্টানটাইন কেবলমাত্র গল দেশ ও রোম শাসন করলেও, তিনি সমস্ত রোমান সাম্রাজ্য জয় করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ৩২৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একক সম্রাট হন। ৩৩৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অত্যন্ত নিষ্ঠুর একজন শাসক। ফলে, তিনি জনসাধারণকে চরমভাবে নির্যাতন করেছিলেন ; বর্বর জাতির নরপতিদের জীবন্ত হিংস্র পশুর সামনে ফেলে হত্যা করেছিলেন ; তবুও কিন্তু তাঁর শাসনকাল রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ, তিনিই প্রথম রোমে নতুন কন্‌স্টানটিনোপল নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কন্‌স্টানটাইন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীস্টধর্ম নিষিদ্ধ ছিল। রোমান সম্রাটদের মধ্যে তিনিই প্রথম খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল তার সূচনা তাঁর শাসনকালেই প্রথম দেখা দিয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্য বিকাশের ইতিহাসে কন্‌স্টানটিনোপলের প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রোমান সাম্রাজ্যের উপযুক্ত রাজধানী হিসাবে রোম নগরীর প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যকে বর্বর জাতিগুলির আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নতুন রোমের প্রয়োজন হয়েছিল। রাইন ও দানিয়ুব নদী দুটি বরাবর উত্তর সীমান্ত এবং পারস্যের বিরুদ্ধে পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত ছিল না। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এরকম একটি জায়গায় থাকার প্রয়োজন দেখা দিল, যেখান থেকে আক্রান্ত স্থানে কার্যকরী সাহায্য দ্রুত পাঠানো যায়। এই ধরনের কাজে রোমের কোনও উপযোগিতা ছিল না ; কারণ রোমের অবস্থান কেন্দ্রে থাকলেও প্রত্যেকটি সীমান্ত প্রদেশ থেকে এই শহর সমদূরবর্তী ছিল। রাইন ও ইউফ্রেতিস অঞ্চল দুটিতে

সমভাবে অভিযান পাঠাবার জন্য একটি রাজধানী খুঁজে বের করা সহজ ছিল না। কালক্রমে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে দুজন সম্রাট ও দুটি রাজধানীর প্রয়োজন হল, যাতে রোমান সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে রক্ষা পেতে পারে।

একটি নূতন রোমের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় কন্‌স্টানটাইন কন্‌স্টান্টিনোপল শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কন্‌স্টানটাইন নূতন রাজধানীর জন্য কৃষ্ণসাগরের তীরে বা ই জা ন্টি য়া মে, বর্তমান ইস্তাম্বুল নামে গ্রীক শহরটি নির্বাচন করেন। ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে এ জায়গাটি মাছধরা জেলেদের ছোট গ্রামের চেয়ে কিছুটা বড় ছিল। ট্রয়ে রাজধানী নির্বাচনে একবার ব্যর্থ চেষ্টার পর কন্‌স্টানটাইন বাইজান্টিয়ামেই তাঁর রাজধানী তৈরি করেন।



সম্রাট কন্‌স্টানটাইন



রোম ও কনস্টানটিনোপল শহর দুটি সহ রোম সাম্রাজ্যের বিভাগ

সূচনা থেকেই (৩২৫ খ্রীস্টাব্দ) কন্‌স্টানটাইন একটা বিশাল শহরের

পরিকল্পনা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে নিজেই বর্শা হাতে নিয়ে কন্‌স্টানটাইন এই শহরের সীমারেখা চিহ্নিত করেছিলেন। শহরের বাড়ী তৈরির কাজে চল্লিশ হাজার গথিক কারিগরকে লাগানো হল এবং গ্রীসের শিল্পকলার অনুকরণে এই শহরের বাড়ীঘর সব নির্মিত হল। পাঁচ বছরের মধ্যেই নতুন রোম শিল্পকলায় এবং আকৃতিতে পুরানো রোমের জায়গা অধিকার করল। কন্‌স্টানটিনোপল ছিল পুরানো সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী। পরবর্তীকালে বাইজান্টিয়ামের নাম হয় কন্‌স্টানটিনোপল। এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তার নাম দেওয়া হয়েছে বাইজান্টিয়ামের সভ্যতা। ঐতিহাসিকরা রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশকে 'বাইজাণ্টাইন' সাম্রাজ্য অ্যাখ্যা দিয়েছেন। কন্‌স্টানটাইনের রাজধানীর গ্রীক-ভাষাভাষী জনগণ নিজেদের রোমান বলত। তাদের ধর্মাধিষ্ঠান ছিল গ্রীক বা গোঁড়া ধর্মাধিষ্ঠান। নূতন রোমের ততটা মারাত্মক পৌত্তলিক ঐতিহ্য ছিল না। এই শহরে কোনও পৌত্তলিক মন্দিরও ছিল না; প্রথম থেকেই শহরটি ছিল খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের হাতে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খ্রীস্টধর্মকে বাইজাণ্টাইনের রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দান ঃ কন্‌স্টানটিনোপল শহরের প্রতিষ্ঠার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এই যে, মহামতি কন্‌স্টানটাইন-ই প্রথম সম্রাট যিনি নিজে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাজকীয় নীতির এটা ছিল একটা বিরাট পরিবর্তন। এর ফলে তাঁকে শাসকশ্রেণীর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর সাম্রাজ্যে খ্রীস্টানরা সংখ্যালঘু ছিল এবং সেনেটের অভিজাতরা, রাজকর্মচারীরা এবং সৈন্যরা ছিল প্রধানতঃ পৌত্তলিক। খ্রীস্টধর্ম ছিল প্রাচ্যের এক নূতন ধর্ম। ইহুদীরা এই ধর্ম গ্রহণ করেও পরে এর তীব্র নিন্দা করে। তা সত্ত্বেও কন্‌স্টানটাইন তাঁর ধর্মে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। ধর্মের নামে আদৌ কোনও অত্যাচার ও অবিচার হওয়াতে খ্রীস্টধর্মের প্রতিও তিনি ভীত ছিলেন না। কন্‌স্টানটাইন মনে করতেন, ভগবান তাঁকে যাবতীয় পার্থিব বস্তু শাসন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। ভগবান তাঁকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন যদি তিনি ধর্মাধিষ্ঠানের ঐক্য রক্ষায় তৎপর না থাকেন। রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মাধিষ্ঠানের পরিচালনার ভার সব সময়েই ছিল নরপতিদের বিশেষ অধিকারে। কন্‌স্টানটাইন তাঁর নিজস্ব ধর্মকর্মের জন্য রোমের পোপের সমান মর্যাদাসম্পন্ন একজন যাজক পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের জন্য নিয়োগ করলেন। তাঁর নাম দেওয়া হল 'পেট্রিয়ার্ক'।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাস্টিনিয়ানের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ঃ কন্‌স্টানটাইনের রাজত্বের প্রায় দু'শ বছর পর পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য একজন কৃতী বিচক্ষণ সম্রাটের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম জাস্টিনিয়ান। খুল্লভাত জাস্টিনাসের মৃত্যুর সময় জাস্টিনিয়ানের বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। স্যাবিটাসের পুত্র জাস্টিনিয়ান ৫২৮ খ্রীস্টাব্দে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের একক অধিপতি হন। রাজ্যশাসন, অট্টালিকা নির্মাণ, ধর্ম ও আইন, অর্থনীতি এবং সঙ্গীতে তিনি সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই জাস্টিনিয়ান নিজেকে অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অনলস কর্মীরূপে প্রমাণ করেন।

জাস্টিনিয়ানের সঙ্গে আফ্রিকা, স্পেন, ইতালি প্রভৃতি অঞ্চলগুলির সম্পর্ক দক্ষিণ ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এইসব অঞ্চল জাস্টিনিয়ান আবার অধিকার করেন সত্য, কিন্তু অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর অজস্র অর্থ ও শক্তি ক্ষয় হয়। পারস্যের সঙ্গে জাস্টিনিয়ানের দীর্ঘ বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালের সূত্রপাত হয় পারস্যের রাজা কোবাদের সঙ্গে এক মারাত্মক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। দারাসের দুর্গে রোমান সেনাপতি বেলিসেরিয়াস অতি শোচনীয়ভাবে পারসীক বাহিনীকে পরাজিত করেন। এর কিছুকাল পর রাজা কোবাদের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম চসরইস রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। সেনাপতি বেলিসেরিয়াস ছিলেন অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী।

জাস্টিনিয়ান পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেওয়ার আগেই এক মারাত্মক গৃহ-বিবাদের সম্মুখীন হলেন। এই গৃহ-বিবাদ শীঘ্রই 'নীল' ও 'সবুজ' দল দুটির মধ্যে গৃহযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। 'সবুজ' দল অ্যানাস্ট্যাসিয়াস নামে জনৈক অভিজাতকে সমর্থন করত আর 'নীল' দল জাস্টিনাস ও তাঁর ভাইপোকে সমর্থন করত। ৫৩২ খ্রীস্টাব্দে এই গৃহ-বিবাদ মারাত্মক আকার ধারণ করে ; 'নিকা বিদ্রোহ' নামে এটি পরিচিত। পারসীক যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহের জন্য জাস্টিনিয়ান অ্যানাস্টাসিয়াসের জমানো ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। নাগরিকদের উপর তিনি অতিরিক্ত কর ধার্য করেছিলেন। এর ফলে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। সম্রাটের রক্ষীবাহিনী দুই দলের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বন্দী করে তাদের মধ্যে সাতজনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেনাপতি বেলিসেরিয়াস অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার

সঙ্গে কুখ্যাত এই 'নিকা বিদ্রোহ' দমন করেন। এরপর রাজত্বের অবশিষ্টকাল জাস্টিনিয়ান উচ্চাকাঙ্ক্ষী পররাষ্ট্রনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল রোমান সাম্রাজ্যকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করা। এই সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলি টিউটনিক নরপতিদের অধিকারে ছিল। সেগুলিকে শাসনদণ্ডের নিয়ন্ত্রণে আনার তীব্র ইচ্ছা তাঁর ছিল। জাস্টিনিয়ান অস্ট্রোগথদের হাত থেকে ইতালি উদ্ধার করেন। ইতালিতে অভিযান চালাবার জন্য তিনি বেলিসেরিয়াসকে নিযুক্ত করলেন। বেলিসেরিয়াস বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী নিয়ে র‍্যাভেনা নগর অধিকার করেন। বেলিসেরিয়াস ৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকার ভ্যাণ্ডালদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি ভ্যাণ্ডাল রাজা গেইলামীরকে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। গেইলামীর এ্যাটলাস পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর গেইলামীর স্বেচ্ছায় বেলিসেরিয়াসের কাছে ধরা দিলে বন্দী রাজাকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে কন্‌স্টানটিনোপলে আনা হয়। গেইলামীরকে ফ্রিজিয়ায় জমিদারী দান করা হল। সেখানে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ আরামে দিন যাপন করতে থাকেন। এরপর রোমানবাহিনী গথদের প্রদেশ ডালমাসিয়া অধিকার করল। বেলিসেরিয়াস ৫৩৫ খ্রীস্টাব্দে সিসিলি এবং পরের বছর নেপলস্ অধিকার করে। ৫৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দে বেলিসেরিয়াস অমিতবিক্রমে রোম অধিকার করেন, কিন্তু ফ্রাঙ্ক ও গথদের সম্মিলিত বাধাদানের জন্য তাঁকে গভীর সঙ্কটে পড়তে হয়।


জাস্টিনিয়ান

জাস্টিনিয়ানের রাজত্বের শেষদিকে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। দেশে অর্থাভাব ঘটে। প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ে। জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর (৫৬৫ খ্রীঃ) তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। বাইরের আক্রমণ বাড়তে থাকে। পোপের অধীনে রোম আলাদা রাজ্য হয়। ইতালি ও স্পেন সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হল। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সিরিয়া,

প্যালেস্টাইন, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করল। ফলে বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্য পতনের মুখে এগিয়ে চলল। নবম ও দশম শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সম্রাটরা নিজেদের সাম্রাজ্যের কতকাংশ পুনরুদ্ধার করলেও, একাদশ শতাব্দী থেকে সাম্রাজ্যের পতন আবার শুরু হল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তুর্কীরা কন্‌স্টানটিনোপল অধিকার করলে (১৪৫৩ খ্রীঃ) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের চরম অবসান ঘটে।

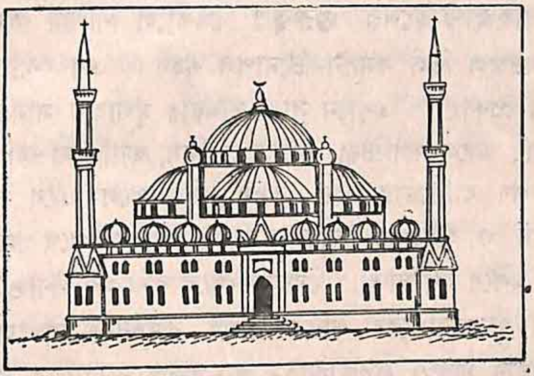
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাস্টিনিয়ানের আইনবিধি : স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকরূপে জাস্টিনিয়ান : জাস্টিনিয়ান প্রধানতঃ রোমান আইনবিধি সঙ্কলন এবং সেগুলির পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মসম্মত সংস্করণ প্রকাশের জন্য বর্তমান পৃথিবীর আইনজ্ঞদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। রাজত্বকালের প্রথমার্ধে ত্রিবোনিয়ানের নেতৃত্বে কনস্টানটিনোপলের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের সহায়তায় জাস্টিনিয়ান এই আইনবিধি সঙ্কলন করেছিলেন।

জাস্টিনিয়ানের আগে রোমান আইনের দুটি উপাদান ছিল—(১) সম্রাটদের শাসনতন্ত্র ও অনুশাসনসমূহ এবং (২) পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের বিচারের ফলাফল। জাস্টিনিয়ানের পূর্বে পাঁচশ' বছরের রোমান অনুশাসন বহু ক্ষেত্রেই অতি শোচনীয়ভাবে পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ে। এগুলির মধ্যে পৌত্তলিক ও খ্রীস্টীয় মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে বহু আইন সেকেলে হয়ে পড়ে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আইনও অচল হয়ে ওঠে।

তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে জাস্টিনিয়ান এইসব অসুবিধা দূর করেন। তাঁর 'কোড' রাজকীয় শাসনতন্ত্রগুলিকে সুষ্ঠু কার্যকরী অবস্থায় পৌঁছে দিল। অথচ অনুশাসনগুলিকে বাদ দিয়ে ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রীস্টান রাষ্ট্রের উপযোগী একটা আইন-ব্যবস্থা প্রচলনের তিনি উদ্যোগ করেন। তাঁর 'ডাইজেস্টে' প্রাচীন আইনজ্ঞদের বিচারের রায় উল্লেখ ছিল। সর্বশেষে তাঁর 'ইনস্টিটিউস্' ছাত্রদের ব্যবহারের উপযোগী করে 'টীকা'র আকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে রোমান আইনের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল। জাস্টিনিয়ানের গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালে ইউরোপের বিধিবদ্ধ বব্যহার-শাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করতে সাহায্য করেছিল।

জাস্টিনিয়ান কেবল তাঁর রাজধানীই নয়, 'নিকা বিদ্রোহে' যে সব সরকারী ভবন ধ্বংস হয়েছিল সেগুলিও পুনর্নির্মাণ করেন। প্রতিরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ ছাড়া জাস্টিনিয়ান তাঁর সাম্রাজ্যের ভিতরে নববিজিত র‍্যাভেনা থেকে আর্মেনিয়ান সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলের শহরগুলি সুন্দর ভাবে গড়ে তোলেন। তিনি যে সব অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন সেগুলি মহান শিল্পনৈপুণ্য বাইজাণ্টাইন শিল্পের 'স্বর্ণ যুগে'র সূচনা করেছিল। কন্‌স্টানটিনোপল ও তার পাশাপাশি জায়গায় তিনি পঁচিশটি গির্জা তৈরি করেছিলেন। ঐতিহাসিক



সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা

প্রোকোপিয়াস (Procopius) তাঁর আটটি বইয়ে সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের আদেশে নির্মিত নানা ধরনের সৌধ, গির্জা প্রভৃতির অপূর্ব কলাকৌশলের বিবরণ দিয়েছেন। জাস্টিনিয়ানের শাসনকালের স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল—কন্‌স্টানটিনোপলের 'হোলি উইজডম' অথবা 'সেণ্ট সোফিয়া' নামে গির্জা। এই গির্জাটি নির্মাণের পরিকল্পনা অ্যান্‌থেনিয়াস এবং ইসিডোর নামে দু'জন স্থপতি করেছিলেন। গির্জার ভিতর থেকে এর গম্বুজটি দেখলে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। ইতালিতে জাস্টিনিয়ানের বিখ্যাত অট্টালিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ক্ল্যাসির ব্যাসিলিকা এবং র‍্যাভেনাতে সেণ্ট ভিটেলের গির্জা। এই অট্টালিকাগুলির ভিতরের মোজাইক হাজার হাজার পাথরের খণ্ড দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল।

জাস্টিনিয়ানের সময় বাইজাণ্টাইনে বহু কৃতী চিত্রশিল্পীও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাইজাণ্টাইন চিত্রশিল্পের বিরাট ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তীকালে এই

চিত্রশিল্প ইতালিয়ান চিত্রশিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই চিত্রশিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিভূ ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের প্রবাসী এল গ্রেকো। তিনি পৃথিবীর সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে এবং কৃষ্টির (সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শন) ধারকরূপে বাইজাণ্টাইনের গুরুত্ব: সেকালে পশ্চিম অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল কন্‌স্টানটিনোপল শহর। এর বন্দর ছিল বিশাল, বাজারও ছিল প্রকাণ্ড। এখানে সারা দুনিয়ার মূল্যবান সামগ্রী বেচা-কেনা হত। সিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, পারস্য, ভেনিস, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশের বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য কন্‌স্টানটিনোপলে এসে ভীড় জমাত। ভারতবর্ষ, চীন ও আফ্রিকা থেকে নানাবিধ পণ্য জলপথে লোহিত সাগরের ভিতর দিয়ে মিশরে পৌঁছাত। সেখান থেকে বণিকেরা পণ্যগুলি উটের পিঠে বোঝাই করে ভূমধ্যসাগরের বন্দরে পৌঁছে কন্‌স্টানটিনোপলে চালান দিত। এমনকি রাশিয়ার সঙ্গেও বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। শোনা যায়, চীন থেকে রেশমের গুটিপোকা লুকিয়ে এনে এ রাজ্যে রেশম-শিল্পের প্রবর্তন করা হয়।

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে যেমন পৌত্তলিক গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শনের বিকাশ হয়েছিল, সেই সঙ্গে তেমনি খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রও বিকাশ লাভ করে। এ কারণে গ্রীক ধর্মাধিষ্ঠানকে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। জাস্টিনিয়ান অবশ্য এথেন্সে কয়েকটি পৌত্তলিকতা-বিশ্বাসী দার্শনিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও গ্রীক কৃষ্টির ভাবধারা ও ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ছিলেন যাঁরা এই ভাবধারায় শিক্ষালাভ করতেন। গ্রীক সাহিত্যের পঠন-পাঠন ব্যাপকভাবে হত। গ্রীক সাহিত্যকে পাণ্ডুলিপিতে ধরে রাখা হয়েছিল, যতদিন না মুসলমান পণ্ডিতরা এর সন্ধান পেয়েছিল। যে সব বাইজাণ্টাইন পণ্ডিত গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করে রেখেছিলেন, তাঁদের কাছে পশ্চিম ইউরোপ গভীরভাবে ঋণী।

পাণ্ডুলিপিগুলি অক্ষুণ্ণ রেখে এবং নকল করে বাইজাণ্টাইন পণ্ডিতগণ

বড় বড় অভিধান ও বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। এই সাম্রাজ্যে উচ্চমানের ঐতিহাসিক রচনা প্রণীত হয়েছিল। তাছাড়া সাধুদের জীবনী, চিকিৎসা-শাস্ত্র, আইন ও ধর্মশাস্ত্রের উপরও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। গ্রীক ভাষায় ছোট কবিতা বা প্রবন্ধের সঙ্কলনের জন্য আমরা বাইজান্টাইনের কাছে ঋণী। অনেকক্ষেত্রে সম্রাটরা নিজেরাই ছিলেন পণ্ডিত; কৃষ্টিমূলক কাজকর্মে তাঁরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তীকালে সম্রাট সপ্তম কন্‌স্টানটাইন এইরকম একজন পণ্ডিত ও শাসক ছিলেন। 'প্রথম ব্যাসিলে'র জীবনী ছাড়াও তিনি রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা, বিভিন্ন চিন্তাধারা এবং বাইজান্টাইন রাজ-দরবারে যে সব অনুষ্ঠান পালিত হত সেগুলি সম্বন্ধে লিখেছিলেন। নবম শতাব্দীতে গ্রীক ধর্মাধিষ্ঠানের ফটিয়াস্ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ১০৪৫ খ্রীস্টাব্দে আইন ও দর্শন বিভাগসহ, কনস্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই, উচ্চশিক্ষার জন্য এই শহরে একটি শিক্ষালয় ছিল।

যে কোন দিক থেকেই মধ্যযুগের প্রথমভাগে বাইজান্টাইনের অভ্যুত্থানের গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পারসীক, আরব ও তুর্কীদের হাত থেকে ইউরোপকে বাঁচিয়ে রাখতে, স্লাভদের সভ্য করে তুলতে এবং গ্রীকদের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানকে রক্ষা করতে তথা ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে বাইজান্টিয়াম সভ্যতার অবদান ছিল অসাধারণ।

অনুশীলনী

বাস্তবীভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। সম্রাট কন্‌স্টানটাইন কে ছিলেন ?
২। সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের সিংহাসন আরোহণের সময় রোমান সাম্রাজ্যে ক'জন সম্রাট ছিলেন ?
৩। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলতে কি বোঝায় ?
৪। জাস্টিনিয়ান কে ছিলেন ?
৫। জাস্টিনিয়ান পৃথিবীর আইনজ্ঞদের কাছে অমরত্ব লাভ করেছেন কেন ?
৬। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে কোন্ কোন্ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত ?
৭। বাইজান্টাইন চিত্রশিল্প কোন্ দেশের চিত্রশিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। সম্রাট কনস্টানটাইনের চরিত্র বর্ণনা কর।
২। বাইজান্টিয়ামে কনস্টানটাইনের রাজধানী নির্মাণের বর্ণনা দাও।
৩। খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তনের সময় কনস্টানটাইন শাসকশ্রেণীর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন কেন?
৪। পারস্যের সঙ্গে জাস্টিনিয়ানের যুদ্ধের বিবরণ দাও।
৫। 'নিকা বিদ্রোহ' কেন হয়েছিল? বর্ণনা দাও।
৬। বেলিসেরিয়াসের বিজয় অভিযানগুলি বর্ণনা কর।
৭। ভ্যান্ডাল রাজা গেইলামীর কিরূপে পরাজিত হন বর্ণনা কর।
৮। জাস্টিনিয়ানের আগে রোমান আইনের কি কি উপাদান ছিল?
৯। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কি জান?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। সম্রাট কনস্টানটাইন কেন কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
২। মহামতি কনস্টানটাইন কিভাবে খ্রীস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দিয়েছিলেন?
৩। জাস্টিনিয়ান কিভাবে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন?
৪। জাস্টিনিয়ান কিভাবে রোমান আইনবিধি সংকলন করেছিলেন?
৫। জাস্টিনিয়ানের শাসনকালের স্থাপত্যের বিবরণ দাও।
৬। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৭। কৃষ্টির কেন্দ্ররূপে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভূমিকা কিরূপ ছিল?

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। কোন্ রোমান সম্রাট কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
২। 'নীল' ও 'সবুজ' দল দুটি কাদের সমর্থন করত?
৩। কোন্ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?
৪। কোন্ স্থপতিরা সেন্ট সোফিয়া গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন?
৫। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পণ্ডিতরা কোন্ কোন্ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। রোমান সম্রাটদের মধ্যে — প্রথম খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন?
২। ঐতিহাসিকরা রোম সাম্রাজ্যের — কে 'বাইজান্টাইন' সাম্রাজ্য আখ্যা দিয়াছেন?
৩। জাস্টিনিয়ান পারস্যরাজ — এর সঙ্গে এক মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।
৪। বাইজান্টাইনের সম্রাট সপ্তম কনস্টানটাইন — এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

———

পঞ্চম অধ্যায় | ইসলামের উত্থান ও তার প্রতিক্রিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরব : দেশ ও জাতি : আরব দেশের অবস্থান হল এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে ছ'শ বছর পর এই দেশে এক নতুন ধর্মের প্রচার শুরু হয়। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম **হজরত মহম্মদ**। আরবে যখন হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন তখন ভারতে রাজত্ব করছিলেন হর্ষবর্ধন এবং চীনে চলছিল তাঙ বংশের শাসন।

আরব দেশটির অধিকাংশ স্থানই মরুময়। মাঝে মাঝে কয়েকটি মরূদ্যান রয়েছে। সমুদ্রের ধারে কিছু কিছু উর্বর জমি রয়েছে। এই স্থানে এবং কয়েকটি মরূদ্যানে ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে। আর বাকী অনুর্বর অঞ্চলে কেবল পাহাড় ও মরুভূমি।

প্রাচীন যুগে আরবের যাযাবররা সুমের, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু আরবের এই প্রাচীন সভ্যতার কথা জানা যায় নি। হজরত মহম্মদ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরবরা অর্ধ-সভ্য বর্বরের মত জীবন যাপন করত।

মরুভূমির দেশ আরবের একমাত্র লোহিত সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলটি ছিল উর্বর ও কৃষিকার্যের উপযোগী। এই অঞ্চলে মক্কা, মদিনা প্রভৃতি শহর গড়ে উঠেছিল। শহরের অধিবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী। উটের পিঠে পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে তারা দেশ-বিদেশে যাতায়াত করত। আরবে আর একশ্রেণীর লোক ছিল মরুবাসী—তারা বেদুইন নামে পরিচিত।

বেদুইনদের প্রধান উপজীবিকা ছিল দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ। তাদের সম্পত্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উট, ঘোড়া ও গাধা। যদিও বেদুইনরা খুব রুক্ষ ও হঠকারী ছিল, তা সত্ত্বেও তারা খুব অতিথিবৎসল ছিল। তারা সব সময়ই আগন্তুকদের প্রতি সম্মান দেখাত। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতি এবং কবিতা ও সঙ্গীতের উপর অনুরাগ তাদের চরিত্রে মাধুর্য এনেছিল। মক্কা শহরে কাবা—অর্থাৎ পবিত্র উপাসনাগৃহে একখণ্ড বড় পাথর দেওয়ালে গাঁথা থাকত। পাথরটি আরবদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু বলে গণ্য হত। আরবদের নানা দেবতার মধ্যে আল্লাই ছিল প্রধান। আরবদের যখন এইরূপ অবস্থা তখন হজরত মহম্মদ নূতন ইসলাম ধর্ম প্রচার করে তাদের মধ্যে ঐক্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজরত মহম্মদ ও তাঁর বাণী ঃ ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মক্কা শহরে সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আবত্নল্লা ও মাতার নাম আমিনা বিবি। মহম্মদের জন্মের পূর্বেই আবত্নল্লার মৃত্যু হয়। শিশুকালে মহম্মদ তাঁর পিতামহ আবত্নল মুতালের এবং পিতৃব্য আবু তালেবের স্নেহ-যত্নে পালিত হন।

ত্নঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই মহম্মদ বড় হতে থাকেন। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। উট ও ভেড়া চরিয়ে তাঁকে দিন যাপন করতে হত। কিন্তু শিক্ষিত না হলেও তাঁর স্মৃতিশক্তি ও স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। কালক্রমে বয়স হলে উপার্জনের চেষ্টায় তিনি খাদিজা নামে এক ধনবতী বিধবা মহিলার অধীনে কাজ আরম্ভ করেন। মহম্মদের গুণে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা পরে তাঁকে বিবাহ করেন। কাজকর্ম করলেও মহম্মদের মনের গতি ছিল অন্য রকম। দেশের লোকের অন্ধ বিশ্বাস ও কদাচার দেখে তাঁর মনে ত্নঃখ হল। তাঁর ধারণা হল যে মূর্তিপূজা করা ভুল। তখন তাঁর অন্তরে ধর্মভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—ঈশ্বরের আদেশে তিনি এই মত প্রচার করবেন ঠিক করলেন। মক্কার কাছে হেরা পর্বতে তিনি পনের বছর সাধনা করে ঈশ্বরের দূত জিব্রায়েলের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাণী পান।

চল্লিশ বছর বয়সে হজরত মহম্মদ তাঁর নবধর্ম 'ইসলাম' জনসমাজে প্রচার করতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁর পত্নী খাদিজা, বাল্যসখা আবুবকর, জ্ঞাতি ভাই আলী প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। কিন্তু মক্কার জনসাধারণ মহম্মদকে পাগল বলে বিদ্রূপ করতে থাকে। তিনি রাস্তায় বের হলে লোকে তাঁর গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারত। এইসব অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যার জন্য চেষ্টা চলতে লাগল। বাধ্য হয়ে তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে গেলেন। মহম্মদের মদিনা যাবার বছর (৬২২ খ্রীঃ) থেকেই মুসলমানরা 'হিজিরা' অব্দের গণনা করে থাকে। মদিনার সাধারণ মানুষ মহম্মদকে সাদরে গ্রহণ করল এবং তাঁর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিল। ক্রমশঃ তারা এত ভক্ত হয়ে উঠল যে, এই ধর্মমত প্রচারের জন্য তারা প্রাণ দিতেও রাজী হল। মক্কাবাসীরা একথা জানতে পেরে মদিনা আক্রমণ করল ; মদিনাবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করল। এই যুদ্ধে মহম্মদের শত্রুরা হেরে গেল। এরপর থেকে ইসলাম ধর্ম মক্কায় ও মক্কা থেকে সমস্ত আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

হজরত মহম্মদ যে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম 'ইসলাম ধর্ম'। যারা এই ধর্ম গ্রহণ করে তাদের বলা হয় 'মুসলমান'। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন'। মহম্মদের মৃত্যুর পূর্বেই সমগ্র আরব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কনস্টানটিনোপল, পারস্য ও চীনের সম্রাটদের দরবারেও এই নবধর্ম গ্রহণ করবার জন্য হজরত মহম্মদ আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের কাছ থেকে হজরত মহম্মদ যে সব বাণী ও আদেশ পেয়েছিলেন সেগুলি একত্র করে একটি গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের নাম কোরান। কোরান মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কোরানে প্রত্যেক মুসলমানকেই পাঁচটি বিশেষ বিধি মেনে চলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: (১) ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, (২) দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার নমাজ পাঠ, (৩) রমজান মাসে উপবাস, (৪) মক্কায় হজ বা তীর্থযাত্রা, (৫) আয়ের এক-পঞ্চমাংশ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ।

ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ নেই—সকলেই ভাই ভাই। ইসলামের বাণী শুনে আরবরা ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হল। সকল দলাদলি ও পাপাচার দেশ থেকে দূর হল। তারা সভ্যতা ও গৌরবের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের অগ্রগতির কারণ: খলিফাদের ইতিহাস: নবধর্মে দীক্ষিত আরববাসীরা যেন নতুন উন্মাদনায় মেতে উঠল। পূর্বদিকে ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ থেকে পশ্চিমে ইউরোপ পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উড়ল। মুসলমানদের সাফল্যের কারণগুলির মধ্যে প্রধান ছিল তাদের ধর্মীয় উন্মাদনা। তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেশ ও জাতির জন্য যুদ্ধ করেছিল এবং যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে তৈরী ছিল। ইসলামের জন্য মৃত্যু তাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবজনক ছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে এর ফলে তারা বেহেস্তে (স্বর্গে) শান্তি পাবে। শত্রুর হাতে তাদের দেশের অসম্মানের চেয়ে মৃত্যু তাদের কাছে শ্রেয় ছিল। আরবরা নতুন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ফলে তারা সহজেই শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হত। ইসলামের প্রথম যুগে আরব দেশে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বহু বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। তাঁরা অসাধারণ সাহস, দক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং সামরিক নৈপুণ্যের অধিকারী

ছিলেন। এইসব বিচক্ষণ সেনাপতির নেতৃত্বে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি জয় করা সহজ হয়েছিল। তা ছাড়া, সেনাবাহিনীতে উট ও ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধ করতে মুসলমানরা অসাধারণ নিপুণ ছিল। সবশেষে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতি বিজিত জাতিগুলিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

হজরত মহম্মদ অপুত্রক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান শিষ্যরা আবুবকরকে তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। এই প্রতিনিধিকে বলা হয় 'খলিফা'। খলিফা ছিলেন একাধারে মুসলমানদের ধর্মগুরু ও শাসনকর্তা।

খলিফা পদ পাবার সময় আবুবকরের বয়স ছিল প্রায় ষাট বছর। তা সত্ত্বেও অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বীরত্বপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। নিজের উপার্জিত অর্থে তিনি ফকির দরবেশের মত দিন যাপন করতেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থ প্রতি শুক্রবার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতেন।

আবুবকরের মৃত্যুর পর ওমর খলিফা হলেন। ওমর ছিলেন যেমন বীর তেমনি ধার্মিক। তিনি দীন-দরিদ্রের মত জীবন যাপন করতেন, ভিখারীরা ছিল তাঁর আহারের সময়ের সঙ্গী। ওমর ইসলাম ধর্মের নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁর চরিত্র ছিল একাধারে কোমল ও কঠিন। তিনি নিয়ম করেছিলেন—যারা মদ খাবে, তাদের আশিটি করে বেত মারা হবে।

ওমরের পর ওসমান এবং ওসমানের পর আলী খলিফা নির্বাচিত হন। আলী ছিলেন ধার্মিক, উদার ও সুপণ্ডিত। কিন্তু তাঁর সময় থেকেই ইসলাম সাম্রাজ্যে সর্বনাসা গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। সিরিয়ার শাসনকর্তা মোয়াবিয়া খলিফার পদ অধিকার করে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু আলী মোয়াবিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ না করে সন্ধি করেন।

আলীর দুটি পুত্র ছিল, হাসান ও হোসেন। পিতার মত হাসান ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। তিনিও মোয়াবিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ না করে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ বিষ প্রয়োগে হাসানের প্রাণনাশ করেন। আলীর কনিষ্ঠ পুত্র হোসেন কারবালায় এজিদের হাতে নিহত হন।

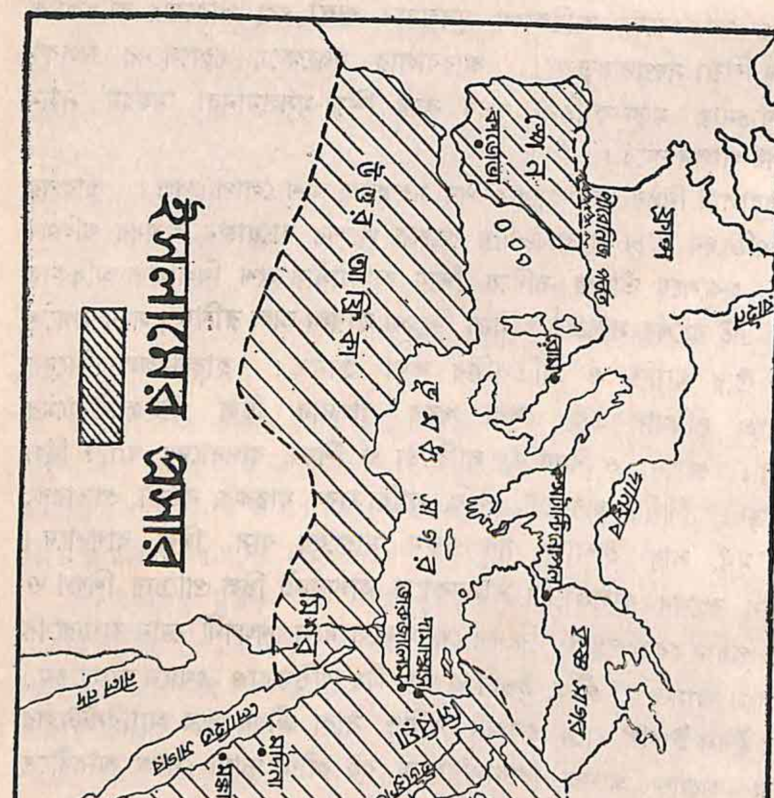
হোসেনের মৃত্যুর পর মুসলমানরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হল। হাসান-হোসেনের দলের নাম হল 'শিয়া', আর অপরটির নাম হল 'সুন্নী'। তুরস্ক,

আরব ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমান **সুন্নী** এবং পারস্যের অধিকাংশ মুসলমান **শিয়া** সম্প্রদায়ভুক্ত। কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে হোসেনের জলকষ্ট এবং শোচনীয় মৃত্যু-কাহিনী স্মরণ করে শিয়া-মুসলমানরা 'মহরম' নামে একটি পর্ব পালন করে।

কারবালার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর মহম্মদের বংশ লোপ পেল। তারপর দুর্বৃত্ত এজিদের মৃত্যু হলে উম্মীয় বংশের পরপর বারোজন বংশধর খলিফা হলেন। অবশেষে তাঁদের সরিয়ে দিয়ে আব্বাসীয় বংশ খিলাফত অধিকার করেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন **হারুন-অল-রশিদ**। সভ্য জগতে সকলেই তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা জানত। হারুণ-অল-রশিদের শাসনকালে দুনিয়ার এক সেরা শহর বাগদাদ ছিল বাইজান্টিয়ামের প্রতিদ্বন্দ্বী। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও শিল্পে, বাগদাদের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। শিল্পী, ব্যবসায়ী, কবি, সাহিত্যিক, যাদুকর, নর্তকী, প্রতারক, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু ইত্যাদি সব রকম মানুষের বাস ছিল বাগদাদে। আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের শাসনকালে বাগদাদই ছিল প্রাচ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রস্থল। বিদেশ থেকে দলে দলে শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণের জন্য এখানে আসত। গ্রীক, ইহুদী ও ভারতীয় পণ্ডিতরাও এখানে আসতেন। এই যুগে **ইবন ইশাখ** নামে একজন পণ্ডিত সারা জীবন ধরে অ্যারিস্টটলের বই এবং অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানবিষয়ক বই গ্রীক ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন।

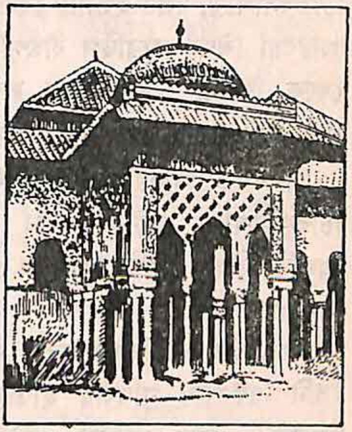
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরব সাম্রাজ্য ও কর্ডোভা: ইসলামের প্রসারে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া: খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভিসিগথদের পরাজিত করে আরবরা স্পেন দেশের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করল। স্পেনের আরবরা 'মূর' নামে পরিচিত। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। পূর্বাঞ্চলে বাগদাদ ছিল আরবীয় সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র। পাশ্চাত্যে এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র ও পণ্ডিতরা এসে মিলিত হতেন। এখানে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। কার্ডোভা নগরে অনেক গ্রন্থাগার ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল রাজবাড়ীর গ্রন্থাগার। কর্ডোভা নগরের লোকংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। এই শহরে তিন হাজার আটশ' মসজিদ,


ইসলামের প্রসার
উত্তর আফ্রিকা
স্পেন
কর্ডোভা
পিরেনিজ পর্বত
ফ্রান্স
রোম
ভূমধ্য সাগর
কনস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ সাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
দামাস্কাস
জেরুজালেম
মিশর
নীল নদ
লোহিত সাগর
মদিনা
মক্কা
আরব
বাগদাদ
পারস্য
পারস্য উপসাগর
ক্যাস্পিয়ান সাগর
ভারত
সিন্ধু নঃ

আশি হাজার দোকানপাট, আট হাজার অট্টালিকা এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাতশ' স্নানাগার ছিল।

কর্ডোভার নিকটে জহরা প্রাসাদের স্তম্ভ ছিল চার হাজার, দরজা ছিল পনের হাজার। প্রাসাদের মাঝখানে ছিল একটি পারার হ্রদ। এই হ্রদে যখন সূর্যকিরণ এসে পড়ত তখন সমস্ত প্রাসাদটি বিদ্যুতের মত চমকাত। স্পেন দেশে মুসলমাদের আর একটা সমৃদ্ধ শহর হল গ্রানাডা। এই শহরে 'আল্‌হাম্‌রা-'র (লোহিত প্রাসাদ) শিল্প-কৌশল বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দুর্গের মত করে আল্‌হাম্‌রার প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল। দুর্গের ভিতর ছিল রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদের স্তম্ভ ও ফটকগুলিতে নানারূপ লতাপাতা ও আরবী অক্ষরের কারুকার্য ছিল।



আল্‌হাম্‌রার প্রাসাদ

মুসলমানদের স্পেন বিজয় এই উপদ্বীপের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বিজয় সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করে অভিজাত এবং দরিদ্রদের একই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করল। অভিজাত এবং যাজকদের অধিকার ও সুযোগগুলি বিনষ্ট হল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (মুসলমান ও অমুসলমান) উপর আরোপিত গুরু করভার কমানো হল। ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হল, কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি হল। ৭১৯ খ্রীস্টাব্দে আল্‌-সামা ফ্রান্সে অভিযান করার জন্য স্পেনে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। আল্‌-সামা পীরেনিজ্‌ পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ফ্রান্স অধিকার করেন। এরপর তিনি এ্যাকুয়াটেইনের রাজধানী টুঁলতে পৌছান। কিন্তু এখানে এই মুসলিম সৈন্যাধ্যক্ষ ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস মার্টেলের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। ইউরোপে মুসলমানদের বিজয় অভিযান এই প্রথম প্রতিহত হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃষ্টি, কলা ও বিজ্ঞানে আরবদের অবদান : কয়েকজন আরবী মনীষীর পরিচয় : আরব সাম্রাজ্যে পারসীক, ইহুদী, ভারতীয় প্রভৃতি নানা সুসভ্য জাতি বাস করত। তাদের কাছে আরবরা গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। ভারতীয়দের কাছ থেকে আরবরা শিক্ষা করেছিল বীজগণিত ও গণনার সংখ্যা। কেবল দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেই আরবরা তৃপ্ত ছিল না, তারা নানাবিধ জ্ঞানের উন্নতিসাধন করে ইউরোপে শিক্ষাবিস্তার করেছিল।

বিখ্যাত আরবী পণ্ডিত **আবু সিনা** ছিলেন চিকিৎসক ও দার্শনিক। চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আবু সিনা ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত।

আরবীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন **আল তাবারী**। তিনি একখানি পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি ছিল বিশাল। আল তাবারী প্রতিদিন চল্লিশ পাতা করে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইতিহাস লিখে গেছেন। আর একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন 'মুকদ্দমা' গ্রন্থের রচয়িতা **ইব্‌ন্ খলদুন**। তিনি কেবল রাজা-বাদশাহদের সাধারণ ইতিহাস লিখেই ক্ষান্ত হননি। কিরূপে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে এবং এগুলি থেকে কিভাবে ইতিহাসের ধারার পরিবর্তন হয় তা দেখানোর চেষ্টাও তিনি করেছেন।

ইউরোপীয়দের কাছে **ইব্‌নে রোশেদ** ছিলেন মুসলমান পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ইউরোপে তিনি আভেররোয়েস নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান কর্ডোভা। ইব্‌নে রোশেদ গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি অনেক চিকিৎসাশাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আরবীয় পর্যটকদের মধ্যে **আল বিরুনীর** নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণকালে আল বিরুনী পাঞ্জাবে এসে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। আল বিরুনী 'ভারত' নামে এক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর এমন তথ্যপূর্ণ বই কোন বিদেশী লিখতে পারেন নি। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের শাসনকালে মরক্কোবাসী **ইব্‌ন বতুতা** ভারতে আসেন এবং এদেশ সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন। এই বই থেকে তুঘলক যুগের ভারত সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। আরব দেশের অবস্থান কোথায়? ২। আরব দেশটি কেমন ছিল? ৩। হিজরী কাকে বলে? ৪। হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্মের নাম কি? ৫। ওমর কে ছিলেন? ৬। আবুবকর কে ছিলেন? ৭। হাসান ও হোসেন কে ছিলেন? ৮। কারবালার যুদ্ধ বিখ্যাত কেন? ৯। কর্ডোভা কোথায় এবং কিজন্য বিখ্যাত? ১০। ইউরোপে ইসলামের অগ্রগতি কে ব্যাহত করেছিলেন? ১১। মুর কারা? ১২। আলহাম্‌রা কি? ১৩। আবু সিনা কে ছিলেন? ১৪। আল তাবারী কে ছিলেন? ১৫। ইব্‌ন্ বতুতা কে ছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। বেদুইন কারা? তাদের সম্বন্ধে যা জান লেখ। ২। হজরত মহম্মদের পূর্বে আরবদের ধর্মীয় জীবন কিরূপ ছিল? ৩। কোরানের নির্দেশগুলি কি কি? ৪। ইসলাম ধর্মের স্বরূপ বর্ণনা কর। ৫। ইসলামের অগ্রগতির কারণসমূহ আলোচনা কর। ৬। খলিফা আবুবকরের চরিত্র বর্ণনা কর। ৭। ওমর কিরূপ খলিফা ছিলেন? ৮। খলিফা হারুন-অল-রশিদ কেন বিখ্যাত ছিলেন? ৯। কর্ডোভা শহরের বিবরণ দাও। ১০। জহরা প্রাসাদের বিবরণ দাও। ১১। দুজন বিখ্যাত আরবীয় ঐতিহাসিকের বিবরণ দাও।

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পূর্বে আরব দেশ ও জনগণের পরিচয় দাও।
২। হজরত মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষাসমূহ আলোচনা কর।
৩। মহম্মদের মৃত্যুর পর আরব খলিফাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম কিরূপে আধিপত্য প্রসার করেছিল?
৫। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরব মনীষিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৬। কয়েকজন আরব ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ কর এবং তাঁদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ কি? ২। কোরান কি? ৩। খলিফা বলতে কি বোঝায়? ৪। মোয়াবিয়া কে ছিলেন? ৫। এজিদ কে ছিলেন? ৬। 'শিয়া' ও 'সুন্নী' কারা? ৭। আল সামা কে? ৮। অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ গ্রীক ভাষা থেকে আরবী ভাষায় কে অনুবাদ করেছিলেন? ৯। ভারত সম্বন্ধে আল বিরুনীর গ্রন্থখানির নাম কি? ১০। কার শাসনকালে ইব্‌ন্ বতুতা ভারতে এসেছিলেন? ১১। ইউরোপে ইসলামের অগ্রগতি কখন প্রতিহত হয়?

সঠিক উত্তরের পাশে ✓ বসাও ঃ

(ক) হজরত মহম্মদ প্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন মক্কায়/মদিনায়।
(খ) আফ্রিকাবাসী মুসলমান পর্যটক ছিলেন আলবিরুনী/ইব্‌ন্ বতুতা।
(গ) আরব পণ্ডিতদের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন আবুসিনা/ইব্‌ন খলদুন।

ষষ্ঠ অধ্যায় | মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ [আনুমানিক ৮০০-১২০০ খ্রীঃ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

শার্লাম্যানের নেতৃত্বে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান ঃ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সব জার্মান উপজাতি নূতন নূতন রাজ্য গড়ে তুলেছিল, ফ্রাঙ্করা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। তারা উত্তর গল (ফ্রান্স) ও দক্ষিণ জার্মানীতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে **শার্লাম্যান** ছিলেন পিপিনের পুত্র ও মার্টেলের পৌত্র। সম্রাট হয়ে তিনি 'চার্লস দি গ্রেট' বা মহামতি চার্লস উপাধি ধারণ করেন; 'শার্লাম্যান' ঐ কথারই ফরাসী রূপ। তিনি ছিলেন ফ্রাঙ্ক উপজাতির ক্যারোলিনজিয়ান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। মহামতি চার্লস ৭৬৮ থেকে ৮১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।


শার্লাম্যান

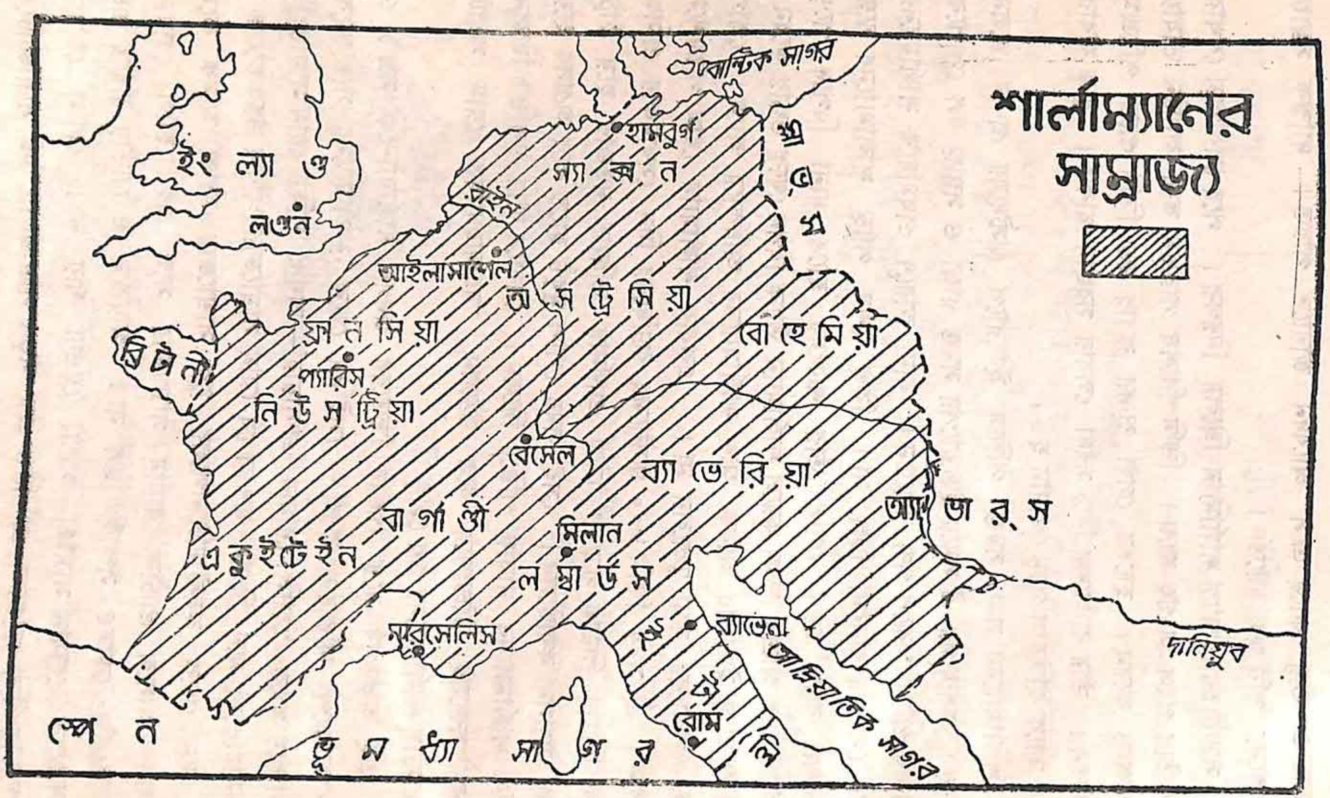
আইনহার্ডের বিবরণ থেকে শার্লাম্যানের জীবনচরিত জানা যায়। শার্লাম্যান দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল দীর্ঘ, নাক ছিল লম্বা, সুগঠিত এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন উজ্জ্বল চোখ। তিনি রাগলে কেউ তাঁর দিকে তাকাতে সাহস পেত না। তাঁর দেহে ছিল অসম্ভব শক্তি। তাঁর ঘুষির জোরে নাকি ঘোড়া সমেত ঘোড়সওয়ার কাত হয়ে পড়ত। বর্ম-পরা যোদ্ধাকে কাঁধ পর্যন্ত তুলে ধরা শার্লাম্যানের পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। আহারে এবং পোশাকে তিনি ছিলেন যথার্থ ফ্রাঙ্ক। শার্লাম্যান নিজে ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী। সকল বিষয়েই তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ; সভাসদ্ ও পণ্ডিতরা তাঁর প্রশ্নবাণে অস্থির হয়ে পড়তেন। শার্লাম্যান অত্যন্ত পরিহাসপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। অবহেলিত দরিদ্র প্রজাবর্গ তাঁর কাছে সুবিচার পেত। সাধারণ

প্রজারাও তাঁর কাছে এসে আবেদন জানাতে পারত। দাম্ভিক সম্ভ্রান্ত লোকদের তিনি জব্দ করতেন।

সম্রাট হবার আগে শার্লাম্যান ছিলেন নিরক্ষর। পরে লেখাপড়া শেখার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মে। তিনি বিশেষ পারশ্রম করে ল্যাটিন ভাষায় জ্ঞানলাভ করেন। হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করতেন। তাঁর বালিশের নিচে সর্বদা লেখার সরঞ্জাম থাকত। যুদ্ধে যাবার সময় তাঁকে ইতিহাস পড়ে শোনান হত।

শার্লাম্যানের সময় সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে খ্রীস্টধর্মের প্রধান ছিলেন পোপ। মধ্যযুগের ঐ সময়ে ইউরোপের সমস্ত রাজা ও সম্ভ্রান্ত দল পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করতেন। নানা কারণে প্রথমদিকে শার্লাম্যনের সঙ্গে পোপের বনিবনা ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শার্লাম্যানের সঙ্গে পোপের বন্ধুত্ব হয়। পোপ তাঁর শত্রুদের হাতে নানা বিপদে পড়ে শার্লাম্যানের আশ্রয় ভিক্ষা করলে শার্লাম্যান তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এই সুযোগে ইতালীর অনেক অংশ শার্লাম্যানের অধিকারে আসে। পোপ এই উপকারের কথা ভুললেন না। একবার শার্লাম্যান রোম পরিদর্শনে এলেন। ঐ সময় তিনি ৮০০ খ্রীস্টাব্দের বড়দিনের দিন সেখানকার প্রসিদ্ধ সেন্ট পিটার গির্জায় পুত্রদের নিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে হাঁটু মুড়ে উপাসনা করছিলেন। সেই সময় পোপ মুকুট হাতে করে অগ্রসর হয়ে সেটা শার্লাম্যানের মাথায় পরিয়ে দিলেন। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, “মহামহিমান্বিত রোম সম্রাট অগাস্টাস্ শার্লাম্যানের জয় হোক্।”

এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে গির্জার ভিতরের জনগণ শার্লাম্যানকে সম্রাট ও ধর্মরক্ষকরূপে অভিহিত করল। সেইদিন থেকে শার্লাম্যানের সাম্রাজ্যকে বলা হয়ে থাকে ‘হোলি রোমান এম্পায়ার’—অর্থাৎ ‘পবিত্র রোম সাম্রাজ্য’। জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মাল যে রোম সাম্রাজ্যের আবার উদ্ভব হয়েছে। ঐ দিন থেকে কনস্টানটিনোপলের পূর্ব সাম্রাজ্যের মর্যাদা অনেক কমে গেল। আসলে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই ‘হোলি রোমান সাম্রাজ্যে’র কোনও সম্পর্ক ছিল না। আয়তনে ও জাতীয় চরিত্রে এই সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্য আখ্যা দেওয়া যায় না। হোলি রোমান এম্পায়ার ছিল ফ্রাঙ্কদের প্রতিষ্ঠিত এক নতুন সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যটিকে একটি বৃহৎ জার্মান রাজ্য ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।


শার্লাম্যানের সাম্রাজ্য
বাল্টিক সাগর
হামবুর্গ
স্যাক্সন
ইংল্যাণ্ড
লণ্ডন
রাইন
আইলাসাপেল
অস্ট্রেসিয়া
ফ্রানসিয়া
প্যারিস
ব্রিটনী
নিউসট্রিয়া
বোহেমিয়া
বেসেল
ব্যাভেরিয়া
অ্যাভারস
বার্গাণ্ডী
মিলান
একুইটেইন
লম্বার্ডস
র‍্যাভেনা
মারসেলিস
দানিয়ুব
আড্রিয়াটিক সাগর
স্পেন
ভূমধ্য সাগর
রোম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শার্লাম্যানের রাজত্বকালের গুরুত্ব ঃ শার্লাম্যান চেয়েছিলেন রাজশক্তি ও ধর্মের প্রভাবে খ্রীস্টান সমাজে ঐক্য স্থাপন করতে। তাঁর চেষ্টা বহুলাংশে সফলতা লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন খ্রীস্টধর্মের প্রবল অনুরাগী। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশী স্যাক্সন জাতি ছিল এই ধর্মের ঘোর বিরোধী। স্যাক্সনরা খ্রীস্টান যাজকদের হত্যা করে তাদের গির্জাগুলি পুড়িয়ে ফেলত। স্যাক্সনদের দমন করার জন্য শার্লাম্যান বার বার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। একবার তাঁর আদেশে পাঁচ হাজার স্যাক্সন বন্দী ও নিহত হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে স্যাক্সনদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হল। শেষ পর্যন্ত স্যাক্সনরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। পূর্ব ইউরোপের অনেক উপজাতিকে শার্লাম্যান এইভাবে জোর করে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করান। শার্লাম্যান তাঁর নিজের রাজ্যে বহু গির্জা স্থাপন করেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

শার্লাম্যানের রাজধানী ছিল রাইন নদীর তীরে অ্যাকেন (এ-লা-শাপেল) নগরে। পরে এর নাম রাখা হয় নূতন রোম। রাজপ্রাসাদটি মোজাইক শিল্পকার্যে সুন্দর করে সাজান হয়েছিল। তাঁর চেষ্টায় রাজ্যের নানাস্থানে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল। শার্লাম্যান নিজে শিক্ষিত না হলেও জ্ঞানীর কদর করতেন। তিনি ইউরোপের নানা জায়গা থেকে লেখক ও পণ্ডিত এনে রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংলণ্ডের অ্যালকুইন, পিসা নগরীর পিটার, স্পেনের অ্যাগেবার্ড ও থিওডলফ্ এবং লোম্বার্ডির পল। ইংরেজ পণ্ডিত **অ্যালকুইন** ডেন জলদস্যুদের ভয়ে ইংলণ্ড ছেড়ে শার্লাম্যানের আশ্রয়ে আসেন। অ্যালকুইনের বিদ্যাবুদ্ধি দেখে শার্লাম্যান তাঁকে খুব সমাদর করলেন। অ্যালকুইনের পরামর্শে তিনি রাজ্যের নানা জায়গায় গির্জা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। শার্লাম্যানের রাজসভায় তাঁর জীবনচরিতকার **আইনহার্ডও** ছিলেন। ইনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। শার্লাম্যান নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় কথা বলতে শিখেছিলেন। গ্রীক ভাষাও তিনি বুঝতেন।

শার্লাম্যানের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর সভায় বাগদাদ থেকে খলিফা হারুন-অল-রশিদ একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। এই দূতের সঙ্গে হারুন-অল-রশিদ তাঁকে একটি হাতি ও একটি আশ্চর্য জলঘড়ি উপহার দিয়ে-ছিলেন। সম্রাট বা শাসক হিসাবেই যে শার্লাম্যান খ্যাতির অধিকারী ছিলেন

তা নয়, মধ্যযুগের প্রথমে যে অজ্ঞানের অন্ধকার ছিল, সেখানে তিনি জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিলেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, জ্ঞান-পিপাসা ও কর্মনিষ্ঠার জন্যই মধ্যযুগের লোকের মনে তিনি শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন।

তাঁর শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ রাজকর্মচারীদের দ্বারা যাতে উৎপীড়িত না হয়, তা দূর করার জন্য তিনি প্রতি বছর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দূত পাঠাতেন। তাঁরা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে তৎপর ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

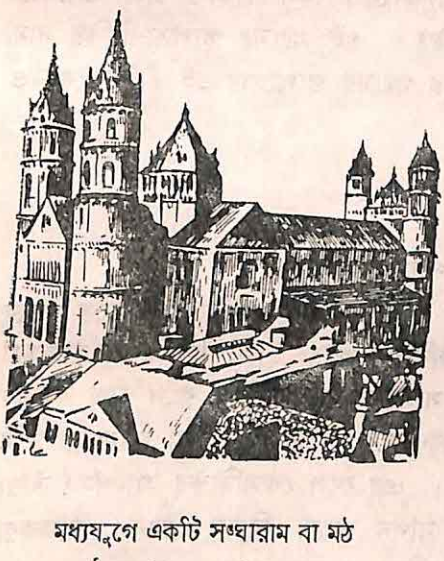
ধর্মের প্রভাবঃ মধ্যযুগে রাজা ও সামন্তশ্রেণী যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু সাধারণ লোক ধর্মভীরু হাওয়ায় সমাজে ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এই সময় ইউরোপের অধিকাংশ লোক খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারা খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের খুবই ভক্তি করত। যাজকদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তাদের মধ্যে কারও কারও প্রচুর সম্পত্তি ও অর্থ ছিল। দেশের আইন তাঁদের উপর প্রযোজ্য হত না। সেকালে যাজকরাই ছিলেন একমাত্র শিক্ষিত লোক। লেখাপড়া জানতেন বলে তাঁদের 'ক্লার্ক' বলা হত। অবশ্য সকল যাজকই যে অত্যন্ত উচ্চ চরিত্রের ছিলেন তা নয়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দারিদ্র্য ও পরহিতব্রতের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে কলুষ ও অধঃপাতিত জীবন যাপনও করতেন।


একজন 'ক্লার্ক'

সঙ্ঘারাম বা মঠগুলি ছিল মধ্যযুগে শিক্ষা ও ধর্মের কেন্দ্র। পল্লী-অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচুর জায়গা নিয়ে মঠ স্থাপন করা হত। সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা মঠগুলিতে উদার হস্তে দান করতেন এবং মৃত্যুকালে মঠের নামে সম্পত্তি লিখে যেতেন। এইভাবে মঠগুলি খুব বিত্তশালী হয়ে উঠত।

মধ্যযুগের যাজকদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন রোমের 'পোপ'। পোপ ইচ্ছা করলে কোনও ব্যক্তিকে কর্মচ্যুত বা সমাজচ্যুত করতে পারতেন। সারা দেশে তিনি ধর্মাচার বন্ধ করে দিয়ে লোকের মনে পরলোকে নরকবাসের আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপের যে কোনও দেশের রাজাকে বিধর্মী আখ্যা দিয়ে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করতে পারতেন।

মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন 'অ্যাবট'। তিনি খুবই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। 'অ্যাবট' তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে থাকতেন। অন্যান্য পুরোহিত ও সন্ন্যাসী মঠের বাইরে একসঙ্গে বাস করতেন। আশপাশের অঞ্চলগুলি অ্যাবটকে বিশেষ সম্মান করত। অ্যাবটের সহকারীকে বলা হত 'প্রায়র'। প্রায়রের নিচে ছিলেন সাধারণ যাজকগণ। যাজকরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর যাজক লক্ষ্য রাখতেন যাতে খ্রীস্টান গৃহস্থেরা তাদের ধর্মাচারগুলি যথাযথ পালন করে। প্রত্যেক জেলায় বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে এই শ্রেণীর যাজকদের 'বিশপ' বলা হত। আর এক শ্রেণীর যাজক মঠে থেকে জপতপ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। তাঁদের বলা হত 'মঙ্ক' বা সন্ন্যাসী। অ্যাবটরা যেসব কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করতেন মঠবাসী মঙ্কদের সেগুলি পালন করতে হত। নিয়মগুলি ছিল: চিরজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করা, দরিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করা এবং মঠাধ্যক্ষের আদেশ মেনে চলার জন্য শপথ গ্রহণ করা। এগুলি পালন করলে তবেই মঙ্করা মঠে থাকতে পারতেন। অনেক স্ত্রীলোকও মঙ্কদের মত সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করতেন। তাঁদের বলা হত 'নান' বা সন্ন্যাসিনী। নানরা পৃথক মঠে বাস করতেন। এই মঠগুলিকে বলা হত 'নানারি'। 'ফ্রায়ার' নামধারী এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী দেশে দেশে ঘুরে খ্রীস্টধর্ম ও নীতি প্রচার করতেন। ফ্রায়াররা কেবল বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। যেখানে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা



মধ্যযুগে একটি সঙ্ঘারাম বা মঠ

দিত সেখানে গিয়ে দুঃস্থদের সেবা করতেন। ফ্রায়ারদের বিভিন্ন দল বা ভ্রাতৃসংঘ ছিল।

শিক্ষাদীক্ষায় যাজকরা বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। জনসাধারণ তাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে উপকার পেত। দরিদ্ররা যাজকদের কাছেই সাহায্য পেত। যাজকরাই রোগীর চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতেন। এসময় ইউরোপে কেবল চার্চ-পরিচালিত হাসপাতাল ছাড়া চিকিৎসার অন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গরীবরা কেবল মঠবাসী সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে ভিক্ষা পেত। যাজকরা সর্বদাই নিরাশ্রয় ও দুঃস্থদের সাহায্য করতেন।

তা ছাড়া, যাজকদের আরও দু-একটি শ্রেণী ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব যোদ্ধা সেবা-শুশ্রূষার ভার নিতেন তাঁদের 'সোলজার প্রিস্ট' বা যোদ্ধা-সন্ন্যাসী বলা হত। যে সব যাজক সৈনিক হয়ে ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতেন তাঁদের বলা হত 'ফাইটিং মঙ্ক' বা সন্ন্যাসী যোদ্ধা।

খ্রীস্টানদের উপাসনার জন্য পশ্চিম ইউরোপে এক নূতন গির্জা বা ভজনালয় তৈরি হয়েছিল। এই গির্জাগুলি ছিল প্রকাণ্ড এবং এগুলির চূড়া ক্রমশঃ সরু হয়ে আকাশে উঠত। এই ধরনের স্থাপত্য-রীতির নাম ছিল 'গথিক স্থাপত্য'। অবশ্য বর্বর গথদের স্থাপত্যের এই রীতির কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্লুনির মঠের সংস্কারসমূহ ঃ কালক্রমে মঠগুলি দুর্নীতিতে ভরে উঠল। জমিদারের কাছ থেকে জমিজমা আর টাকাপয়সা পেয়ে যাজকরা আদর্শচ্যুত হয়ে উঠল। গির্জাগুলি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ করত। পোপ, আর্চবিশপ, বিশপ থেকে শুরু করে সাধারণ যাজকরা নিজেদের জমি ও অর্থের পরিমাণ বাড়াতে থাকেন। এর ফলে বেনেডিক্টের আদর্শমত তাঁরা সহজ, সরল ও নীতিপূর্ণ জীবন যাপন থেকে বিচ্যুত হলেন। যাজকরা বিবাহাদি করে সুখী আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকেন। সামন্ত প্রভুরাও নিজেদের পছন্দ মত লোককে বিশপ বা অ্যাবট পদে নিযুক্ত করার জন্য মঠগুলিকে নির্দেশ দিতেন। নির্দেশ অমান্য করলে গির্জাগুলির জমি কেড়ে নেওয়া হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই দুর্নীতিপরায়ণ মানুষই গির্জাগুলির কর্তৃত্ব পেত।

এই রকম শোচনীয় অবস্থা বেশ কিছুকাল চলতে থাকে। ৯১০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের বার্গাণ্ডির অন্তর্গত ক্লুনিতে একটি মঠ স্থাপিত হল। প্রথম থেকেই সামন্ত প্রভু ও রাষ্ট্রের প্রভাব থেকে এটি মুক্ত ছিল। এই মঠটি একমাত্র পোপের অধীনতাই স্বীকার করত। ক্লুনির মঠ কালক্রমে বহু মঠের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। ইউরোপের বহু জায়গায় নূতন নূতন মঠ স্থাপিত হল। এই মঠের অধীনে প্রত্যেক মঠের জন্য একজন করে প্রধান সাধু বা 'প্রায়ার' (Priar) থাকতেন। এঁদের খবরদারী করতেন ক্লুনির মঠের 'অ্যাবট' বা যাজক। সবার উপরে ছিলেন রোমেরই পোপ। মঠের সাধুরা ছিলেন বেনেডিক্টপন্থী। তাঁরা মঠের সন্ন্যাসীদের অনাড়ম্বর জীবন যাপন, ব্রহ্মচর্য পালন, প্রার্থনা ইত্যাদি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে তাঁরা সন্ন্যাসীদের দৈহিক পরিশ্রম করতে নির্দেশ দেননি।

ক্লুনির ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, রাজশক্তি ও সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করে ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য আধ্যাত্মিক সাধনা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ স্থায়ী করা। ক্লুনির ধর্মসংস্কার-আন্দোলন মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফ্রান্সের এই মঠটির নিয়ম-শৃঙ্খলা, আচার-অনুষ্ঠান অন্যান্য মঠের তুলনায় বেশী কঠোর ছিল। কালক্রমে এই মঠটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় মঠ বলে খ্যাত হল। সমগ্র ইউরোপে এই মঠের গ্রন্থাগারটি ছিল তখনকার দিনে উজ্জ্বলতম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পোপ ও সম্রাটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাধান্য ঃ পোপ কর্তৃক শার্লাম্যানের রাজ্যাভিষেকের ফলে খ্রীষ্টীয় গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পোপকে সাহায্য করা, গির্জার সম্পত্তি রক্ষা করা ও খ্রীস্টধর্ম প্রসার করার জন্য শার্লাম্যান প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু এই সদ্ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হল না। ক্রমশঃ পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার লড়াই শুরু হল। পোপের দাবি হল, যেহেতু তিনি ভগবানের প্রতিনিধি এবং সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকরী, সুতরাং সম্রাটের চেয়ে তাঁর মর্যাদা অনেক বেশী। সম্রাট দাবি করলেন, পোপের অধীনস্থ যাজকরা সম্রাটের জমিজমা ভোগ করেন বলে তাঁরা সম্রাটের

আদেশ মানতে বাধ্য। নূতন বিশপকে কার্যভার গ্রহণের সময় সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর ক্ষমতার চিহ্ন হিসাবে আংটি আর দণ্ড গ্রহণ করতে হত।

পোপ সপ্তম গ্রেগরী এই প্রথাকে বে-আইনী বলে অস্বীকার করলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও সৎধর্মীয় নেতা। বিশপ ও অ্যাবটদের গৃহী জীবন যাপন করার তিনি বিরোধী ছিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহ-পুষ্ট বিশপরা পোপের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। ১০৭৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রেগরী ঘোষণা করলেন, ধর্মীয় পদে কাউকে নিয়োগের ক্ষমতা একমাত্র ধর্মাধিষ্ঠানের ধর্মীয় নেতাদেরই থাকবে। এর ফলে রাজা চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হল। সপ্তম পোপকে এর ফলে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। সালের্নোতে গিয়ে তাঁকে প্রায় নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়েছিল। রাজা চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুর বহু পূর্বেই চার্চ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ মধ্যযুগে শার্লাম্যানের সময় থেকে শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। মধ্যযুগের প্রথম দিকে মঠ ও বিশপদের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা কুক্ষিগত ছিল। শার্লাম্যানের আনুকূল্যে মঠ, চার্চ, নানারিতে, এমনকি গ্রামের ছোট চার্চগুলিতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মঠের সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়াও সাধারণ মানুষ এই বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করতে পারত। দশম শতাব্দীতে মঠসংলগ্ন বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা কমে গিয়ে বিশপদের দ্বারা পরিচালিত ক্যাথিড্রাল স্কুলগুলির সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই স্কুলগুলির সংখ্যা বাড়তে থাকে। স্কুলের পাঠ্যসূচী দুভাগে বিভক্ত ছিল—প্রথম ভাগে ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র এবং দ্বিতীয় ভাগে অঙ্ক, জ্যামিতি, সঙ্গীত ও জ্যোতির্বিদ্যা। যেসব ক্যাথিড্রাল স্কুলে মেয়েরা পড়ত তাদের সংখ্যা কম ছিল। মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং নূতন নূতন শহর সৃষ্টির ফলে শিক্ষিত বহু লোকের প্রয়োজন হল। তাই শুধুমাত্র যাজক-শিক্ষকরা ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও শিক্ষক নির্বাচিত হতে থাকে। এইসব শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকতা করতেন। ইউরোপে ক্রমে বেতনভোগী শিক্ষক-পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা বেড়ে গেল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স শিক্ষাক্ষেত্রে ইউরোপের অগ্রণী দেশ ছিল। ফ্রান্সের ক্যাথিড্রাল স্কুলগুলির খ্যাতি ছিল সমগ্র ইউরোপে। এই স্কুলগুলি পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিণত হল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা পড়াশোনা করতে আসত। এক-একটি দেশের ছাত্রদের একসঙ্গে 'নেশন' (Nation) বা জাতি বলা হত। প্রত্যেক জাতির জন্য একজন করে প্রোকটর (Proctor) বা উপদেষ্টা থাকতেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একজন করে 'ডীন' থাকতেন। সেই বিষয়ের অন্যান্য শিক্ষক তাঁর অধীনেই শিক্ষকতা করতেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য আলাদা কোন বাড়ি ছিল না। চার্চের ভেতরই নির্দিষ্ট ঘরে পড়াশোনা হত। প্যারিস ছাড়া ফ্রান্সে আরো কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

মধ্যযুগে ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দুটি স্থাপিত হয়। প্যারিসের অনুসরণে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১২০৯ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ডের কিছু পণ্ডিতদের চেষ্টায় কেম্ব্রিজে একটি স্কুল হল। ১২৩৩ খ্রীস্টাব্দে এটি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে উন্নীত হল।

পশ্চিম ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ইতালীর বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সবচেয়ে প্রাচীন। চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য এটি বিখ্যাত ছিল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর রোম, রেভেনা, মিলান, সারবোন, ভেরোনা, স্যানটুয়া প্রভৃতি জায়গার স্কুলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে ওঠে।

স্পেনের রাজা সনদ (Charter) দেওয়াতে সেখানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে স্যালামেনক, প্যালেনোসিয়া, ভ্যালাভোনিভ প্রসিদ্ধ ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে ইউরোপের শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও জনমত প্রচারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। বলা যেতে পারে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার ফলে যেমন একদিকে এখানকার শিক্ষিত জনসাধারণ সরকারী ও বেসরকারী কাজকর্মে যোগ দিল, তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ঃ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মধ্য ইউরোপে, বিশেষতঃ উত্তর গলের বহুস্থানে, বহু বিদ্যালয় ও শিক্ষক ছড়িয়ে ছিল। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কোনও পদ্ধতি বা নিয়ম ছিল না। ধর্মাধিষ্ঠানের সনন্দপ্রাপ্ত এবং শিক্ষকতায় যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি শিক্ষকতা করতে পারতেন। ছাত্ররা শিক্ষকদের অনুসরণ করত এবং খ্যাতির হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলিতে ছাত্রদের ভিড় হত।

মধ্যযুগের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিটার অ্যাবেলার্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর মতে, বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে যা সত্য বলে প্রমাণিত, তাই গ্রহণ করা উচিত। বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি বড়। তাঁর বিখ্যাত বই-এর নাম 'হাঁ ও না'। অ্যাবেলার্ডের দুই শিষ্য আর্নল্ড ও পিটার লম্বার্ডিও পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইংরেজ পণ্ডিত রোজার বেকন অক্সফোর্ড ও প্যারিসে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। বেকন প্রচার করলেন যে বিজ্ঞানের বিষয় জানতে হলে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি দেখে ও পরীক্ষা করে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি নিজেও অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। ফলে সেকালের লোকেরা তাঁকে শয়তানের চেলা মনে করে চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল। অ্যালবার্ট ম্যাগনাসও বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করতেন। কিন্তু সে যুগের অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন **টমাস অ্যাকুইনাস**। তিনি দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু তাদের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ছাত্রদের জীবন ছিল আদিম ও উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু অনেক বিষয়েই তারা বিংশ শতাব্দীর ছাত্রদের সঙ্গে তুলনীয়। সেকালে ছাত্রদের বেতনেই শিক্ষকদের ভরণ-পোষণ হত। ছাত্রসংখ্যা কমলে শিক্ষকদের আয়ও কমত। দরিদ্র ছাত্র এবং দরিদ্র শিক্ষকের আর্থিক অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্ক সাধারণতঃ খুব ভাল ছিল। তবে ছাত্রদের কিছু অংশ শহরে গিয়ে মাঝে মাঝে উৎপাত করলে শহরবাসীদের সঙ্গে তাদের মারামারি হত। অধ্যাপক ও তাঁর সহকর্মীরা ছাত্রদের বিবাদ নিষ্পত্তি করে তাদের শান্ত করতেন। এইরকম বিবাদকে

'টাউন ও গাউনে'র বিবাদ বলা হত, কারণ ছাত্রদের সেই যুগে গাউন পরতে হত। একবার প্যারিসের লোকেরা ছাত্রদের বেদম প্রহার করলে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে অধ্যাপকরা বিদ্যালয়ের দরজা তালা বন্ধ করে চলে গেলেন। পরে প্যারিসবাসীরা আশ্বাস দিয়ে আবার তাঁদের শহরে ফিরিয়ে আনে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-ব্যবস্থার বিকাশ (আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায় ও সাহিত্য): খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বোলানা শহরের আইন বিদ্যালয়টি ইরনেনিয়াস্ নামে জনৈক প্রসিদ্ধ রোমান আইন-শিক্ষকের প্রচেষ্টায় বিকাশলাভ করেছিল। ১১৫৮ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা আইন-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে এই শিক্ষায়তনকে অনুমোদন দিয়েছিলেন। বোলানায় অত্যন্ত সস্তায়, কম সময়ে এবং ভালভাবে আইনশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া যেত।

জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক স্যালারনো বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি রাষ্ট্রীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি এই আদেশ জারী করেছিলেন যে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের আগে ছাত্ররা অন্ততঃ তিন বছর নেপলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রদের হিপোক্রিটিস, গ্যালেন প্রভৃতি গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠ করতে হত। মধ্যযুগীয় চিকিৎসকরা মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করার আগে পশুদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করতেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বোলানায় একটি শল্য চিকিৎসার প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে মধ্যযুগে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন টমাস অ্যাকুইনাস্। ফরাসী পণ্ডিত হ্যালীসের আলেকজাণ্ডারও ধর্মতত্ত্বে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রোজার বেকনেরও ধর্মতত্ত্বে অনেক অবদান আছে। পরস্পরবিরোধী উক্তি নিরসনে এবং ভুল দূরীকরণে একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত অ্যারিস্টটলের ন্যায় শাস্ত্রবিদগণ বিশিষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।

প্যারিসে অল্প বয়সের ছাত্ররা সাহিত্য ও কলা বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে যেত। অ্যাবেলার্ড যখন প্যারিসে শিক্ষক ছিলেন তখন তাঁর খ্যাতির কথা জানতে পেরে প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র এই শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। প্যারিস সর্বদাই সাহিত্য, কলা ও ধর্মশাস্ত্র পঠন-পাঠনে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ল্যাটিন ধর্মাধিষ্ঠানের ধর্মতত্ত্ব প্যারিসে সঙ্কলিত করা হয়েছিল। মধ্যযুগের

কৃষ্টিতে সাহিত্যের স্থান ছিল অভিনব। সাহিত্যের যে সব গ্রন্থ মধ্যযুগে প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'দি রোমান্স অব দি রোজ', 'দি ডিভাইন কমেডি', 'দি ক্যান্টারবেরী টেলস্', 'দি ক্যাথিড্রেল অব চার্টারিস'। মধ্যযুগের সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ, উদ্যম ও যৌবনের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় সাহিত্যিকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে বেঁচে থাকা অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং এই পৃথিবীকে পরলোক থেকেও আনন্দময় করা যায়।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। 'ফ্রাঙ্ক' কারা ?
২। শার্লাম্যানের রাজত্বকাল কতদিন স্থায়ী ছিল ?
৩। শার্লাম্যানকে কোন্ পোপ অভিষিক্ত করেছিলেন ?
৪। শার্লাম্যানের রাজধানী কোথায় ছিল ?
৫। অ্যালকুইন কে ছিলেন ?
৬। মধ্যযুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা কখন থেকে শুরু হয়েছিল ?
৭। মঠের অধ্যক্ষ কে ছিলেন ?
৮। 'প্রায়র' কাদের বলা হত ?
৯। নানদের মঠগুলিকে কি বলা হত ?
১০। 'সোলজার প্রিস্ট' কাদের বলা হত ?
১১। পোপ সপ্তম গ্রেগরী কে ছিলেন ?
১২। পিটার অ্যাবেলার্ড কে ছিলেন ?
১৩। রোজার বেকন কে ছিলেন ?
১৪। বোলানা শহর প্রসিদ্ধ ছিল কেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। শার্লাম্যানের দৈহিক আকৃতি ও গঠন কিরূপ ছিল ?
২। শার্লাম্যানের চরিত্র কিরূপ ছিল ?
৩। শার্লাম্যানের বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে কি জান ?
৪। অভিষেকের আগে শার্লাম্যানের সঙ্গে পোপের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ?
৫। শার্লাম্যান কিভাবে স্যাক্সনদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন ?
৬। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ?
৭। শার্লাম্যানের সভাসদদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৮। শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ যাতে উৎপীড়িত না হয় সেজন্য শার্লাম্যান কি করতেন ?
৯। মঠগুলি কিভাবে বিত্তশালী হত ?
১০। ক্লুনির ধর্মসংস্কার আন্দোলনের আগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে কি কি দুর্নীতি ছিল ?
১১। মধ্যযুগে শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠ্যসূচী কি ছিল ?
১২। মধ্যযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ কিরূপে হয়েছিল ?
১৩। মধ্যযুগে সাহিত্যে বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। শার্লাম্যানের নেতৃত্বে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান কিভাবে হয়েছিল ?
২। শার্লাম্যানের ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৩। শার্লাম্যান বিদ্যাশিক্ষার প্রসার কিভাবে করেছিলেন ?
৪। শার্লাম্যানের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল কেন ?
৫। মঠগুলিতে কিভাবে শিক্ষার চর্চা হত ?
৬। 'পোপে'র ক্ষমতা সম্বন্ধে কি জান লেখ।
৭। জনসাধারণ যাজকদের কাছ থেকে কিভাবে উপকার পেত ?
৮। 'ক্লুনি'র ধর্মীয় সংস্কারগুলি আলোচনা কর।
৯। পোপ ও সম্রাটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল ?
১০। শিক্ষা-ব্যবস্থায় মধ্যযুগে কিভাবে বিবর্তন এসেছিল ?
১১। মধ্যযুগে ইউরোপের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের পরিচয় দাও।
১২। মধ্যযুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কিরকম ছিল ?
১৩। মধ্যযুগে আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায় ও সাহিত্যের বিকাশ কিভাবে হয়েছিল ?

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। জার্মান উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল কারা ?
২। ফ্রাঙ্কদের প্রথম শক্তিশালী রাজার নাম কি ?
৩। হারুন-অল-রশিদ শার্লাম্যানকে কি উপহার পাঠিয়েছিলেন ?
৪। শার্লাম্যানের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত খলিফার নাম বল।
৫। যাজকদের 'ক্লার্ক' বলা হত কেন ?
৬। মধ্যযুগে যাজকদের মধ্যে সর্বপ্রধান কে ছিলেন ?
৭। বিশপ কাদের বলা হত ?
৮। 'নেশন' বলতে কি বোঝায় ?
৯। 'ডীন' কাকে বলা হত ?
১০। 'প্রোকটর' কে ?
১১। পিটার অ্যাবেলার্ডের বিখ্যাত বইয়ের নাম কর।
১২। টমাস অ্যাকুইনাস কে ছিলেন ?

সপ্তম অধ্যায় | মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামন্তপ্রথার ভিত্তি ছিল জমির বন্দোবস্ত ঃ সামন্ততন্ত্র বলতে সঠিক কি বোঝায় তা বলা খুবই কঠিন, কারণ এই প্রথা ছিল অত্যন্ত জটিল এবং সামন্ততন্ত্রের সমস্ত জটিল ব্যবস্থা কোন সংজ্ঞার মাধ্যমে বোঝানো প্রায় দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। খ্রীষ্টীয় নবম অথবা দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের জনগণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ক যে ব্যবস্থার দ্বারা চালিত হত তাকে সামন্তপ্রথা আখ্যা দিলে আমরা এই প্রথা সম্পর্কে একটা আন্দাজ করতে পারি।

মেয়ার্স নামে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সামন্ততন্ত্রকে জমির বন্দোবস্তের উপর রচিত এক বিশেষ ধরনের সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থারূপে বর্ণনা করেছেন। এই ব্যবস্থা ভালভাবে বিকাশ লাভ করেছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এর আগে রাজারা যে সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করতেন তা পরে বড় বড় জমির মালিকরা করতে আরম্ভ করলেন। অন্য কথায় জমি অধিকারের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা যুক্ত হল। রাজা ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। তিনি এইসব জমি বড় বড় প্রজা বা অভিজাতদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। জমিদারেরা আবার তাঁদের জমির অনেক অংশ 'দাস' বা প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দিতেন। জমি গ্রহণকারী তার চুক্তির শর্তরূপে প্রভুকে শাসন-ব্যবস্থায় সাহায্য করতে অঙ্গীকার করত। তার প্রধান কর্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ছিল প্রভুর বিচারালয়ে উপস্থিত থেকে বিচারে সাহায্য করা, সৈন্যরূপে প্রভুর কাজ করে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং প্রভুকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা। যুদ্ধের সময় প্রভুরা এইভাবে তাঁদের নিম্নতন প্রজার সৈন্য-সাহায্য পেতেন। প্রভু তাঁর অধীন প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের অসাধারণ উন্নতির কারণ ছিল হাজার হাজার দাসের নিরলস পরিশ্রম। তাদের সাহায্যেই সম্রাট বা রাজারা যুদ্ধ করে দেশ জয় করতেন। রোমের দুর্বলতার জন্য দাসবিদ্রোহ হয় ও একসময় দাসপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক বিভাগসমূহ : বেসরকারী জনগণ কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা : সামন্তপ্রথার সমাজ ছিল অনেকটা পিরামিডের মত। এই সমাজের সবচেয়ে উপরে ছিলেন রাজা, তাঁর নিচে সামন্তবর্গ, তারপর বড় ও ছোট জমিদারের দল। এইভাবে সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরে ছিল দরিদ্র সাধারণ। এদের মধ্যে যাদের অবস্থা কিছু ভাল ছিল তাদের বলা হত 'ভিলেন'। আর 'সার্ফ' বা ভূমিদাস ছিল তারাই যারা জমি নিয়ে মেহনত করত কিন্তু এই জমিতে তাদের কোনও অধিকার ছিল না।

শার্লাম্যানের সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর স্থানীয় জমিদাররা তাঁদের নিজ-নিজ অঞ্চলে সার্বভৌম অধিকার গ্রহণ করে ব্যক্তিগত ও বেসরকারী শাসন-ব্যবস্থা নিজ-নিজ এলাকায় চালু করেছিলেন। দুর্বল রাজারা ঐ সময়ে তাঁদের নিজ-নিজ এলাকায় দক্ষ শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। ফলে তাঁরা রাজনৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বেসরকারী জনগণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বেসরকারী জনগণ এই দায়িত্বগুলি পালনে সক্ষম ছিল। পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়িয়েছিল যে প্রত্যেক ছোট সামন্তপ্রভু (যার উপরে বড় সামন্ত এবং সবচেয়ে উপরে ছিলেন রাজা) তাঁর নিজ-নিজ এলাকায় স্বাধীন রাজার মত আচরণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ এই সময় হাজার হাজার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন কিন্তু দুর্বল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণবিশিষ্ট জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল।

সামন্ততন্ত্রে আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জমি অধিগ্রহণ-ব্যবস্থা যার উপর এই প্রথার ভিত্তি নির্ভর করত। ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করত সে কি পরিমাণ এবং কিরূপ জমির মালিক। যে জমি তার অধিকারে আছে সেই জমির উপর তার সরকারী পদও নির্ভর করত। প্রভুকে শাসন-ব্যবস্থায় সাহায্য করার চুক্তিতে যে কোনও লোক অন্যের জমি গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারত। এই চুক্তির মধ্যে ছিল বিচারে প্রভুকে সাহায্য করার জন্য প্রভুর দরবারে হাজির থাকা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশী কর্তব্য পালন করা, এবং সৈন্যের যাবতীয় কাজ করা বা প্রভুকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা। প্রভুর প্রতি অধীন সামন্তের এই শেষ কর্তব্যটি সামন্ততন্ত্রকে একটি সামরিক পদ্ধতিতে পরিণত করেছিল।

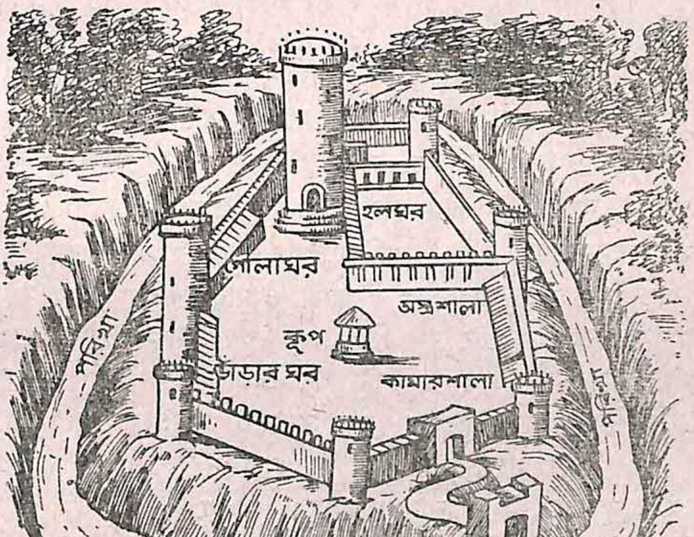
সামন্ততন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই ব্যবস্থায় সামাজিক শ্রেণীগুলি দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—'শাসক-শ্রেণী' এবং 'শাসিতজনগণ'।

শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই জনগণ যারা জমির মালিক ছিল এবং শাসিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই জনসমষ্টি যারা ভূমি চাষ করত। ছোট ও বড় ভূম্যধিকারিগণ সহ রাজা শাসক-জনগণের এবং 'ভিলেন' ও 'সার্ফ'রা শাসিত-জনগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জমিই সমাজের কাঠামো নির্ধারণ করত। যে ব্যক্তিগত চুক্তি দ্বারা সামন্ত প্রভু ও তাঁর অধীন ভূম্যধিকারীর সম্পর্ক নির্ধাতিত হত তা সামন্ততন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। জমিদারও তাঁর প্রভুর প্রতি আনুগত্য দেখাতেন, একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেখানে পারস্পরিক কর্তব্যগুলি সম্পাদনের কথা তাঁরা ঘোষণা করতেন। জমি গ্রহণ এবং সামন্ত ও তাঁর প্রভুর সম্পর্কগুলি নির্ধারিত হত এই অঙ্গীকার চুক্তির মাধ্যমে, রাষ্ট্রের কোনও আইনের দ্বারা নয়। এইভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও কম প্রতিপত্তিশালী জমিদার তুলনামূলকভাবে সবল জমিদারের সেবা করত এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত করত। এরকম ব্যবস্থায় কারও সম্মান হারানোর ভয় ছিল না, কারণ প্রভু এবং তাঁর অধীন জমিদার একই শ্রেণীর অভিজাতরূপে বিবেচিত হতেন। অধিকাংশ প্রভুই জমিদার ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় প্রভুও রাজার আইনের দৃষ্টিতে জমিদারই ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ও জমি গ্রহণ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের উপর নয়, ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা যেহেতু ডিউক, কাউন্ট, ব্যারন বা বিশপের হাতে ছিল, সেই কারণে সামন্তরাজারা তাঁদের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতেন ও তাঁদের কর দিতেন। সামন্তরাজারা ফিউডাম (feudum) অর্থাৎ জায়গীর পেতেন—ফিউডাম কথা থেকেই ফিউডালিজম (feudalism) বা সামন্ত-প্রথা কথাটির জন্ম বলে মনে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপ রক্ষায় দুর্গগুলি ও বর্মপরিহিত ঘোড়সওয়ারদের ভূমিকা ঃ সামন্ততান্ত্রিক স্থাপত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছিল দুর্গগুলি। প্রতিরক্ষার তাগিদেই দুর্গগুলি তৈরী হয়েছিল। সাধারণতঃ দুর্গগুলি তৈরী হত পাহাড়ের চূড়ায় বা প্রাচীরবেষ্টিত কৃত্রিম মাটির স্তূপের উপর, যার আশেপাশে কোনও নদী অথবা ছোট খাল থাকত। গ্রাম-অঞ্চলের খোলা মাঠে দুর্গগুলি একে অন্যের সামনে তৈরী হত। নিজ নিজ প্রভুর স্বাধীনতা এবং শক্তি দ্বারা দুর্গগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল ঘোড়সওয়ারদের উপর। ইভান্স নাবে লেখক

'মধ্যযুগীয় ফ্রান্স' বইতে ঐ যুগে দুর্গ কিভাবে তৈরী হত তা বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগের অধিবাসীগণ যত উঁচু সম্ভব এরূপ একটি মাটির পাহাড় তৈরী করত। তারপর বেশ চওড়া কৃত্রিম খালের দ্বারা এই পাহাড়টিকে ঘিরে ফেলত। খালের ভিতরের দিকে তারা ঘন কাঠের গুঁড়ি পুঁতে দিত। কাঠের এই বেষ্টনীর জায়গায় বুরুজ তৈরী করে একে শক্ত করা হত। এই পাহাড়টির চূড়ায় তারা একটা বাড়ী বা দুর্গ তৈরী করত যা থেকে চারদিকে নজর রাখা সম্ভব ছিল। খালটি ছিল বেশ চওড়া, সব সময়েই জলে ভরতি থাকত। দুর্গের প্রবেশপথে ছিল প্রকাণ্ড দরজা, পাল্লার গায়ে লোহার পুরুপাত ও পেরেক লাগানো। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কাঠের তৈরী দুর্গগুলি এইভাবে তৈরী হত। দুর্গের ভিতরের ঘরগুলি ছিল খুবই ছোট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঘরগুলিতে জানালার বদলে কতকগুলি বড় বড় ছিদ্র ছিল।



মধ্যযুগের দুর্গ

ছিদ্রগুলির ভিতরের দিকে চকচকে কাপড়ের পর্দা থাকত। মধ্যযুগের শেষভাগ পর্যন্ত ধর্মাধিষ্ঠানের স্থাপত্যে কাঁচের ব্যবহার দেখা যায় না।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে এইরকম দুর্গের সংখ্যা অনেক থাকলেও পরে পাথরের

তৈরী দুর্গ নির্মিত হতে থাকে যাতে দুর্গে বাসস্থান ও ভাঁড়ারের যাবতীয় ব্যবস্থা একসঙ্গে থাকে। এই দুর্গগুলি দোতলা, তেতলা বা বহুতলার ছিল। দুর্গ-প্রাচীরের ভিতরে ক্রমে নতুন নতুন বাড়ী তৈরী হতে থাকে; সামন্তপ্রভুও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য বেসরকারী বাসস্থান, কর্মচারী ও অতিথিদের জন্য বেসরকারী বাসগৃহ, গির্জা, আস্তাবল ও গুদামঘরগুলি তৈরী করা হত। কেবল ওপরের বড় ও সুরক্ষিত মিনারটি দুর্গরূপে প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে দুর্গগুলিতে পাথর-কাটার মজুররা, দুর্গ ও বাড়ীর নক্সা তৈরী করার কারিগররা এবং রাজমিস্ত্রীরা দুর্গে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ঐ সময়ও দুর্গের নিচের অংশ পাথর দিয়ে এবং উপরের তলাগুলি কেবল কাঠ দিয়ে অথবা আংশিক কাঠ ও আংশিক পাথর দিয়ে তৈরী হত। মধ্যযুগের তৈরী দুর্গগুলির মধ্যে প্যারিসের উত্তরে 'কৌচির দুর্গ, ১৯১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ঐ সময় জার্মানরা দুর্গটি ধ্বংস করে।

মধ্যযুগে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল সামরিক তৎপরতা। বিশাল দুর্গগুলি নির্মাণের পরও নাইটদের ব্যক্তিগত সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের ক্রমাগত ব্যয়ও নিতান্ত কম ছিল না। নাইটের ঘোড়া, বর্ম, ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামই নয়, তাঁর অধীন পেজ, স্কোয়ার প্রভৃতি যোদ্ধাদের ঘোড়া ও সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হত। অভিজাতগণ এজন্য স্বাভাবিকভাবেই ঘোড়ার সংখ্যা বাড়াতে উৎসাহী হন এবং বারবারী ও বাইজান্টাইন থেকে বহু ঘোড়া আমদানি করেন। নাইটের বর্ম ছিল একটি বেশ দামী সামগ্রী। প্রথমদিকে এই বর্মটি কোমর পর্যন্ত এবং পরে হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তা ছাড়া, একটি মোচাকৃতি শিরস্ত্রাণ নাইটের মাথা রক্ষা করলেও মুখমণ্ডল রক্ষায় ব্যর্থ ছিল। অবশ্য বর্মের দ্বারা নাইটের নাকটি রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই বর্মের ওপরে নাইট তাঁর কারুকার্যময় পোশাক পরতেন। মধ্যযুগের অস্ত্রনির্মাতারা ক্রমশঃ আরও মারাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবন করতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'cross-bow' নামে ধনুকের প্রচলন হলে নাইটরা তাঁদের বক্ষদেশ রক্ষা করার জন্য বর্মের উপরে বা নিচে একটুকরো লোহার পাত ব্যবহার করতে থাকেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘোড়া ও তার সওয়ারকে যথাযথভাবে বর্ম দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রতিরক্ষার জন্য নাইট ডিম্বাকৃতি, ঘুড়ির আকারের মত বা তিনকোণা ঢাল ব্যবহার করতেন। পরবর্তী কালে ঢালের প্রয়োজন কমে আসতে থাকায় ক্রমশঃ এর আকার ছোট হতে থাকে। নাইটের

সাধারণ অস্ত্রের মধ্যে বর্শা, তলোয়ার এবং সামনাসামনি যুদ্ধের জন্য ছোরা ছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে নাইটরা যে কেবল বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করেছিলেন তা নয়, তাঁরা ধর্মাধিষ্ঠান, দরিদ্র, অসহায়, অনাথ, বিধবা এবং তীর্থযাত্রীদেরও রক্ষা করতেন। সংক্ষেপে বলা চলে, নাইটদের জীবন ছিল দেশের এবং জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত। যুদ্ধ এবং শান্তির জন্য নাইটদের কাহিনী ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে।



নাইটের বর্ম

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামন্ততন্ত্রে জীবন ধারা ঃ সামন্তপ্রভুগণ দুর্গে বসবাস করতেন। ঐ যুগে চিকিৎসকের অত্যন্ত অভাব থাকায় সামন্তপ্রভুদের স্ত্রীরাই চিকিৎসক ও পরিচারিকার কাজ করতেন এবং তাঁদের স্বামীদের জমিদারীতে অসুস্থ ও দরিদ্র প্রজাদের দেখাশুনা করতেন।

মধ্যযুগে খাদ্যের প্রাচুর্য থাকলেও বৈচিত্র্যের অভাব ছিল এবং ক্রুসেডের আগে পর্যন্ত মশলা ছাড়া রান্না হত। সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল গমের রুটি ও শাকসবজি। এই সময়ে বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, পেঁয়াজ, বীম, মটরশুঁটি, আপেল, ন্যাশপাতি এবং মাছ ও মাংস ছিল খাদ্যের প্রধান উপকরণ। পানীয় হিসাবে দুধ ব্যবহৃত হলেও অনেকটা দুধ দিয়ে পনীর তৈরী করা হত, দুধ থেকে মাখনও তৈরী হত। জনসাধারণ মদও পান করত। এই যুগে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে আঙ্গুর চাষ শুরু হয়েছিল। দক্ষিণ ইউরোপে জলপাই-এর চাষ হত। ইউরোপে চিনির প্রচলন হবার আগে মিষ্টির জন্য ফলের রস ও মধুর ব্যবহার ছিল। চিনি বিলাসিতার উপকরণ এবং ওষুধরূপেও ব্যবহৃত হত।

কাঠ জ্বালিয়ে বা আগুনের ভিতরে পাত্র রেখে রান্না করা হত। আসবাব-পত্র ছিল কম ও পুরানো ধরনের। শীত ও গ্রীষ্মে সাধারণ মানুষ পশমের জামা পরত। দুর্গের ভিতরে এত ঠাণ্ডা যে গ্রীষ্মকালেও প্রচুর কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন হত। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে রেশম ও সুতীর কাপড় ইউরোপে প্রচলিত হলে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে অন্তর্বাসের প্রচলন হল। কিন্তু এইসব সামগ্রী অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে বিছানা ছিল; মশার কামড় থেকে রেহাই পাবার জন্য মশারির ব্যবস্থাও ছিল। উঁচু শ্রেণীর মানুষ পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। প্রত্যেকটি দুর্গের উঠানে একটি করে জলাশয় ছিল এবং সীসার নলের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জল পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। ভাল দুর্গগুলিতে স্নান করার জন্য টব ও পায়খানা ছিল।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তীর্থযাত্রীদের কাছে গল্প শোনা, ভালুকের নাচ দেখানো, ভ্রাম্যমাণ যাদুকরদের যাদুবিদ্যা দেখা এবং চারণ-কবিদের গান শোনা। যখন মেলার প্রচলন হল তখন পরিবারের সবাই মিলে হয়ত এক সপ্তাহের জন্য এই মেলা দেখতে যেত। অভিজাতদের সময় কাটাবার প্রধান উপায় ছিল শিকার করে বেড়ানো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিভালরি ঃ ট্রুবেডারগণ ঃ শিভালরি ছিল এক ধরনের বিশেষ সামরিক নিয়মকানুন। নাইটরা পবিত্র জীবন যাপনের শপথ গ্রহণ করতেন। পদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বিশেষ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ছিল নাইটের ধর্ম। **'শিভালরি'** কথাটি বলতে প্রথমে কেবল একদল ঘোড়সওয়ারকে বোঝাত। এই কথাটি মধ্যযুগীয় ফরাসী শব্দ 'Cheval' (ঘোড়া) থেকে উদ্ভূদ হয়েছিল। কিন্তু পরে কোমলতা, নম্রতা ও উদারতার প্রতীক হয়ে উঠল এই শিভালরির সদস্যরা। শিভালরি ছিল সামন্তপ্রথা ও খ্রীস্টধর্মের সম্মিলিত ফল। এটা ছিল অভিজাতদের একটা সম্প্রদায় যার কোনও নির্দিষ্ট গঠন বা ধরন ছিল না কিন্তু এর সদস্যরা কতকগুলি নিয়ম ও পেশাগত কর্তব্য মেনে চলতেন।

শিভালরি ছিল পৃথিবীজোড়া এক ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়, যাদের ভ্রাতৃবোধ কোনও দেশগত বাধা মানেনি। পূর্বপুরুষের সামরিক অভিজ্ঞতা এই 'ঘোড়সওয়ারী ভ্রাতৃত্ব' অর্জনের এক বড় সহায় ছিল। কোন-কোন সময় সাধারণ সৈনিকের

অসাধারণ বীরত্বও এই ভ্রাতৃত্ব অর্জনের সহায়ক ছিল। কোনও যোদ্ধাকে এই ভ্রাতৃত্বের সদস্যপদ অর্জন করতে হলে চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস থেকে বা কোনও নাইট বা স্ত্রীলোকের কাছ থেকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অস্ত্রগ্রহণ করতে হত। শিভালরির সদস্য নাইটকে বীর, ভদ্র, বিনয়ী, সত্যবাদী, পবিত্র, সদাশয়, অতিথিবৎসল ও কর্তব্যকর্মে বিশ্বস্ত হতে হত; তাঁকে ধর্মপালনে এবং তাঁর সঙ্গীদের রক্ষার জন্য তৎপর হতে হত। উপরিউক্ত গুণগুলি ছাড়াও খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য শিভালরিতে যুক্ত হল —স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান দেখানো। শিভালরির সূত্রপাত হল যখন চার্লস মার্টেল একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এ্যাকুয়াটেইন প্রদেশে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। কার্যকরী প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্যই ফ্রাঙ্করা একমাত্র ঘোড়ার উপর নির্ভর করত। এই নূতন সামরিক ব্যবস্থা ক্রমে দক্ষিণ ফ্রাস থেকে ইউরোপের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

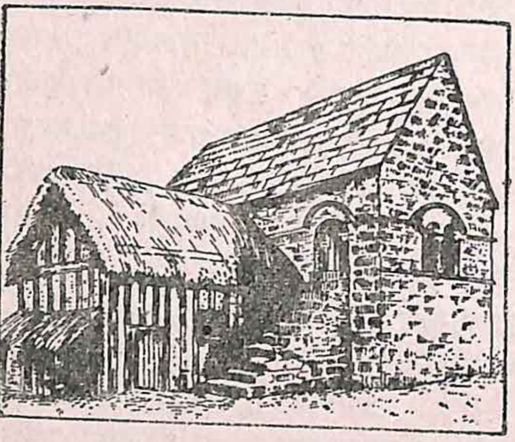
বহু দেশের প্রচলিত গাথা ও সাহিত্যে শিভালরির আদর্শ চিত্রিত আছে। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ ফ্রান্স, উত্তর স্পেন এবং উত্তর ইতালীর চারণ-কবিরা **ট্রুবেডার** নামে পরিচিত ছিলেন। ট্রুবেডাররা কবিতা রচনা করতে পারতেন এবং নতুন সুরে কবিতা গেঁথে গান গাইতেন। ইউরোপে মধ্যযুগে বড় বড় রাজপুত্র, যেমন রিচার্ড দ্য লায়ন থেকে শুরু করে সাধারণ ভবঘুরে পর্যন্ত, ট্রুবেডারের বৃত্তি গ্রহণ করতেন।

মধ্যযুগের কবিতার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ঐ যুগে ট্রুবেডাররা সমাজে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ট্রুবেডারদের সহযোগীরা '**জগ্লার**, নামে পরিচিত ছিল। যে গান ট্রুবেডাররা গাইতেন তার বাজনা এই জগ্লাররা বাজাত। বিকাশকালের দু'শ' বছরের মধ্যে ইউরোপে প্রায় চারশ' ট্রুবেডার আবির্ভূত হয়েছিলেন। ট্রুবেডারদের বাক-স্বাধীনতা ছিল এবং তাঁরা রাজনৈতিক ব্যাপারেও গান রচনা করতেন। তা ছাড়া, সামন্ত তান্ত্রিক প্রভুদের দরবারে নারীদের ঘিরে তাঁরা একটা ভদ্রতা ও কৃষ্টির আবহাওয়া রচনা করেছিলেন। ট্রুবেডারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সপ্তম গুইল্হেম, ব্লেইর জুফরে রুডেল্ এবং গ্যাসকনের স্যাকরাবার্ণ। স্যাকরাবার্ণে পঁয়তাল্লিশটি কবিতা এখনও গাওয়া হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ম্যানর পদ্ধতি ঃ সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক দিক্ ঃ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের শ্রমে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ভূমিচাষকে '**ম্যানর পদ্ধতি**' অ্যাখা দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক্ থেকে বিচার করলে এই ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রের অংশ ছিল। সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্থানীয় কেন্দ্র ছিল ম্যানর বা ম্যানরের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম; কোন-কোন ক্ষেত্রে একটির বেশী গ্রামও ম্যানরের অঙ্গীভূত ছিল। ম্যানর গ্রামে ম্যানরের দরবারের মাধ্যমে জমিদার তাঁর রাজনৈতিক ও সম্পত্তি ভাগ করার অধিকারগুলি তাঁর প্রজা ও কৃষকদের উপর প্রয়োগ করতেন। ম্যানরে বসবাসকারী কৃষকদের অস্বাভাবিক শ্রম ও ব্যাপক খাজনার উপর অভিজাত সামন্ত-তন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ নির্ভরশীল ছিল। অভিজাত সম্প্রদায় শিকার ও যুদ্ধ করত এবং দুর্গ ও গির্জা তৈরী করত, কারণ কৃষকরা তাদের জমিতে প্রচুর পরিশ্রম করে অভিজাতদের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। পশ্চিম ইউরোপ থেকে ম্যানর পদ্ধতি এখনও নিশ্চিহ্ন হয়নি। অসংখ্য কৃষক আজও তাদের নিজ-নিজ গ্রাম থেকে খামারবাড়ীতে চাষের জন্য প্রতিদিন সকালে রওনা হয়। মধ্যযুগে ম্যানরের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালে গ্রামগুলির সীমানা যা ছিল বর্তমানেও তাই আছে। ম্যানর পদ্ধতি সামন্ততন্ত্রের ন্যায়ই প্রাচীন—এই দুটি পদ্ধতি একই সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল। পদ্ধতিটি আংশিক রোমান এবং আংশিক জার্মান। অভিজাত জমিদাররা এবং দরিদ্র কৃষকরা পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্য থেকে উদ্ভব হয়েছিল। এই পরিস্থিতির সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জার্মান উপনিবেশ স্থাপন, মেরোভিনজিয়ান যুগের ক্রমিক বিশৃঙ্খলা এবং নবম শতাব্দীর অরাজক অবস্থা ম্যানর পদ্ধতি বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।



ম্যানর বাড়ী

কতকগুলি ম্যানর রোমান অভিজাতদের বাড়ী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং অন্য ম্যানরগুলি স্বাধীন জার্মান গ্রামীণ সম্প্রদায়-অধ্যুষিত ছিল। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সামন্তপ্রভু গ্রামগুলির উপর আধিপত্য

স্থাপন করেছিলেন। আদর্শ ম্যানর ছিল এরূপ একটি জার্মান গ্রাম, যা তার স্বাধীনতা হারালেও স্থানীয় নিয়মকানুন অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। রোমান জমিদারদের খামারবাড়ী জার্মান গ্রামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সাধারণতঃ এর মালিক ছিলেন জনৈক প্যাট্রিসিয়ান এবং তাঁর জমি ক্রীতদাসরাই চাষ করত। এক্ষেত্রে মালিক ও চাষী উভয়েই স্বাধীন ছিল। জার্মান গ্রামের অবস্থাও রোমান অভিজাতদের খামার বাড়ীর মালিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে খ্রীস্টধর্মের প্রচার ম্যানর পদ্ধতি বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল, কারণ খ্রীস্টান ধর্মাধিষ্ঠান তার নিজস্ব গির্জা-সম্বলিত দেশের যাজনিক বিভাগে বড় বড় জমিদারী যুক্ত করেছিল। এই যাজনিক বিভাগ ও ম্যানর প্রায়ই অভিন্ন ছিল। ম্যানরের প্রভুর সঙ্গে ধর্মাধিষ্ঠানের যে সম্পর্ক ছিল, রোমান প্রভুর পৌত্তলিক মন্দিরগুলির সঙ্গে সেই সম্পর্কের তুলনা করা যায়।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রভাব পশ্চিম ইউরোপে অসমভাবে বিস্তার লাভ করার ফলে আদর্শ ম্যানর পদ্ধতির উদ্ভব সর্বত্র সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, ম্যানর পদ্ধতি পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র বিকাশ লাভ করেনি। পার্বত্য অঞ্চলে, ইউরোপের নিম্নদেশে, জলমগ্ন সমুদ্র থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত জমিতে এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে যেসব জমি উদ্ধার করা হয়েছিল সেগুলিতে পূর্ণ ম্যানর পদ্ধতির প্রচলন হয়নি। সামন্ততন্ত্রের মত ম্যানর পদ্ধতির এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং বিভিন্ন ম্যানরেও পার্থক্য ছিল। ম্যানর পদ্ধতিতে সাধারণ নিয়ম কিছু ছিল না। ইংলণ্ডের ম্যানরের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নর্ম্যাণ্ডি, প্রভেন্স অথবা ডওফিনে ছিল না। ম্যানরগুলির প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকলেও কৃষকদের ভাগ্য সর্বত্রই এক রকম দুর্ভাগ্যজনক ছিল। কৃষকদের জীবন ছিল তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ক্লেশকর সংগ্রাম। কষ্ট হলেও বলিষ্ঠ কৃষকরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জমিতে তাদের পরিশ্রমের ফসল ফলাত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ম্যানর দরবার—গ্রামবাসীদের কৃষি ব্যবস্থা—সামন্তপ্রভু ও চার্চকে দেয় খাজনা (নগদে ও জিনিসপত্রে): ম্যানরের গ্রামে ম্যানর দরবারের মাধ্যমে জমিদার প্রভু তাঁর রাজনৈতিক ও সম্পত্তিগত অধিকার তাঁর প্রজা অগণিত কৃষকদের উপর জারি করতেন। গ্রামে বসবাসকারী কৃষকদের প্রত্যেক ম্যানরের আদালতগুলিতে হাজিরা দিতে বাধ্য ছিল। এই

আদালতগুলি গির্জা বা ম্যানরের হলঘরের প্রশস্ত কক্ষে অথবা ছায়াবহুল গাছের নিচে বসত। গ্রামবাসীরা স্থানীয় রীতি-নীতি অনুসারে তাদের বক্তব্য এই আদালতের সামনে পেশ করত। পরে ম্যানরের রীতি-নীতিগুলি যখন লিখিতভাবে সঙ্কলিত করা হল তখন আইনজীবীর পক্ষে জমিদারদের স্বার্থে এগুলি লঙ্ঘন করা সম্ভব ছিল না।

জমিদার এবং কৃষকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভালভাবে চাষ করে সর্বাধিক শস্য ফলানো। ক্ষুদ্র জমিদার হয়ত কেবল একটা ম্যানরের মালিক থাকতেন কিন্তু বড় জমিদার বেশ কয়েকটা ম্যানরের মালিক ছিলেন। একটা সাধারণ ম্যানরে প্রায় ন' শ' থেকে দু' হাজার একর পর্যন্ত চাষের জমি থাকত। প্রথমে হেমন্তে গম বা রাই বোনা হত এবং গ্রীষ্মকালে তা কাটা হত। বসন্তকালে জমিতে বার্লি, রাই, ওট, বীট ও মটরশুঁটি বোনা হত এবং গ্রীষ্মকালের শেষে কাটা হত। এরপর জমিতে লাঙল দিয়ে ফেলে রাখা হত। চাষের জমিগুলি ছিল খোলা ; প্রাচীর-ঘেরা বা গাছের ছায়ার নিচে কোনও জমি থাকত না। গ্রামের চাষীরা একত্রে জমিগুলিতে লাঙল দিত, বীজ বুনত ও ফসল কাটত। কোনও একটা গ্রাম অন্য গ্রামের সাহায্য ছাড়া জমিতে লাঙল দিতে বা শস্য কাটতে পারত না। যদিও কোন-কোন চাষীর লাঙল ছিল কিন্তু তাদের যথেষ্ট বলদ ছিল না। শস্য কাটার সময়ও একই রকম সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। পুরুষ, নারী এবং শিশুরা একসঙ্গে কৃষিজমিতে কাজ করত।

সামন্ততন্ত্রের নিয়ম অনুসারে জমিদার তাঁর ইচ্ছামত ভূমিদাসের উপর খাজনা ধার্য করতে পারতেন। স্থানীয় রীতি-নীতি কিন্তু ম্যানরে জমিদারের খাজনা অর্থ বা জিনিসপত্রে ঠিক করে দিয়েছিল। তা ছাড়া, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক জমিদারই জানতেন যে কৃষকদের সন্তুষ্ট রাখতে হলে তাদের উপর ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করা ঠিক হবে না। এই বিষয়ে ধর্মাধিষ্ঠান অভিজাতদের সতর্ক করে দিয়েছিল : "বড়কে ছোটর ভালবাসা অর্জন করতে হবে। ঘৃণা যাতে সঞ্চারিত না হয় সে বিষয়ে অভিজাতদের সতর্ক হতে হবে। নীচকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয় ; যদি তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে তবে তারা আমাদের ক্ষতিও করতে পারে। বহু সার্ফ তাদের প্রভুদের হত্যা করেছে এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে।" এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এবং এমনকি এক ম্যানর থেকে অন্য ম্যানরেও খাজনা ধার্যের ধরনে ও পরিমাণে বৈষম্য ছিল। কৃষকদের

প্রতি বছরই 'ক্যাপিটেশন' (Capitation) নামে খাজনা দিতে হত। কৃষকরা এই খাজনা টাকাপয়সা, মাখন বা মোম দিয়ে শোধ দিত। 'ট্যালেজ' (Tallage) নামে জমির উপর প্রত্যক্ষভাবে খাজনা সার্ফদের দিতে হত। প্রতি বছর খ্রীস্টমাস ও ইস্টার পর্বগুলির সময় জিনিসপত্রে সার্ফরা নিজ-নিজ ইচ্ছামত উপহার-সামগ্রী সামন্তপ্রভুদের দিত। সার্ফের পুত্ররা যখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তখন 'হেরিয়ট' (Heriot) নামে উত্তরাধিকারসংক্রান্ত খাজনা জমিদারকে ভাল গৃহপালিত পশু বা উৎকৃষ্ট আসবাবপত্রে দিত।

ম্যানরের এইসব খাজনা দেবার পরও কৃষক ধর্মাধিষ্ঠানকে 'তাইথ' (Tithe) বা ধর্মীয় খাজনা দিত। এই খাজনা পশু বা আসবাবপত্রে দেওয়া চলত। তা ছাড়া, ম্যানরের মধ্যে অবস্থিত পশুচারণ ভূমি, বনভূমি এবং পতিত জমির জন্যও কৃষককে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হত। ম্যানরে বসবাসকারী প্রত্যেক সার্ফকে প্রভুর শস্য পেষাই-এর যন্ত্র, রুটি তৈরীর উনুন, আঙ্গুর থেকে মদ তৈরীর যন্ত্র, বার্লি থেকে চলাই মদ তৈরীর যন্ত্র এবং ম্যানরের রাস্তা ও সেতু ব্যবহারের জন্যও খাজনা দিতে হত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ম্যানরে দুর্গবাসীদের জীবন ঃ তিনটি শ্রেণীর (যাজক, অভিজাত ও স্বাধীন) প্রজাদের জীবনযাত্রা ঃ প্রত্যেকটি ম্যানরে একটি করে ছোট গির্জা থাকত ও তাতে আধা-শিক্ষিত পুরোহিত বসবাস করতেন। পুরোহিতের কাছে ম্যানরবাসীরা ঈশ্বরের কথা শুনত। আনন্দহীন জীবনে ঐটুকুই ছিল তাদের শান্তি ও সান্ত্বনা। তারা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন। পুরোহিত তাদের এই শিক্ষাই দিতেন যে প্রত্যেককে প্রতি রবিবার গির্জায় যাওয়া অবশ্য পালনীয়, যারা মিথ্যা কথা বলে তারা মহাপাপী এবং নরকে বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। ম্যানরের পুরোহিত জনগণকে আরও শিক্ষা দিতেন যে রোমের পোপই ঈশ্বরের প্রতিনিধি—স্বর্গ ও নরকের দরজার চাবি তাঁর হাতে, পোপের কথা অমান্য করা মহাপাপ? ধর্মাধিষ্ঠানকে রক্ষার জন্য ম্যানরবাসী জনগণকে তাদের আয়ের এক-দশমাংশ দিতে হত।

ম্যানরে অবস্থিত দুর্গটি যে জমিদারের একমাত্র বাসগৃহ ছিল তা নয়, ওটা তাঁর জমিদারীর প্রধান দপ্তরও ছিল। এখানেই তাঁর দরবার বসত, তাঁর যাবতীয় কর-সংগ্রহকারীদের হিসাব এখানেই পরীক্ষা করে দেখা হত। তাঁর যাবতীয় কাগজপত্র এখানেই থাকত এবং দুর্গেই তিনি দর্শনার্থী ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা

জানতেন। দুর্গের মধ্যেই তাঁর নিজস্ব বসতবাড়ী ছিল। চ্যান্সেলর, কনেস্টবল, বাটলার প্রমুখ কর্মচারীরাও দুর্গে নিযুক্ত থেকে জমিদারকে তাঁর যাবতীয় কাজে সাহায্য করতেন। কৃষিসহ জমিদারীর যাবতীয় ব্যাপারে প্রভুপত্নীরও বিশদ জ্ঞান ছিল। প্রভুর অনুপস্থিতিতে জমিদারীর যাবতীয় কাজ তিনিই দেখাশোনা করতেন। দুর্গ আক্রান্ত হলে প্রভুপত্নীই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন এবং এজন্য অনেক প্রভুপত্নী নিজেরাই মই দিয়ে দুর্গের দেওয়ালে উঠে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন।

মধ্যযুগের দুর্গে কারও, বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের বিশেষ কোন অবসর ছিল না। তাঁদের অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হত, যাজকীয় বিভাগ পরিদর্শনরত বিশপদের অথবা রোমের পথে আগত কোন 'অ্যাবট'কে তাঁদের আদর-যত্ন করতে হত। পাহাড়ের উচ্চতায় সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গগুলি নির্জন হয়ে পড়ত। দুর্গের লম্বা হলঘরে প্রভু ও প্রভুপত্নী টেবিলে বসে খেতেন। খাবার আয়োজন ভালই থাকত। নানা রকমের মদ ও মাংস, মাছ ও সবজি পরিবেশন করা হত। অনেক পরিচারকের মধ্যে কেউ বা রাঁধত, কেউ বা টেবিল সাজাত আবার কেউ বা ঘর পরিষ্কার করত। হরিণ ও ভেড়ার মাংস ছাড়া, পাখীর মাংসও খাওয়া চলত। উৎসব ও নিমন্ত্রণের সময় আস্ত শূকর ষাঁড়ের মাংস ঝলসিয়ে টেবিলে রাখা হত। যখন অতিথিরা আসতেন তখন মোমবাতির মৃদু বা চর্বির উজ্জ্বল আলোকে দুর্গের প্রধান হলঘরে পান-ভোজন অনেক রাত্রি অবধি চলত। মধ্যযুগের ফিউডাল জমিদাররা এবং অপেক্ষাকৃত ধনী মানুষেরা বেশী আহার করত। খাবার সময় ছুরি দিয়ে, রান্না করা মাংস তারা কাটত এবং নিজেদের হাত দিয়ে খেত। খাবার টেবিলের কাঁটা-চামচ একাদশ শতাব্দীতে কনস্টানটি-নোপল থেকে আমদানি করা হয়েছিল। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে পাশা-দাবার প্রচলন ছিল, যদিও ধর্মাধিষ্ঠান পাশা-খেলা নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিল। অনেক অভিজাত পুরুষ শিল্পকলার চর্চা করতেন। এঁরা মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই যে অল্পবিস্তর কৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

মধ্যযুগের প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তিই দক্ষ শিকারী ছিলেন। যখন কোনও কাজে তাঁকে বাইরে যেতে হত না বা দরবারে হাজির থাকতে হত না, তখন সারাদিন তিনি শিকার করে বেড়াতেন। সামন্ত ও নাইটের দল ঘোড়ায় চড়ে শিকার করে বেড়াতেন; তাঁদের সঙ্গে থাকত কুকুর এবং হাতের কবজিতে

বাঁধা বাজপাখী। জমিদারদের কাজ ছিল যুদ্ধ ও লুটতরাজ। কখনও বা তাঁরা শিকার করে বেড়াতেন। 'এ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিক্‌লে' উল্লেখ আছে যে বিজয়ী উইলিয়াম তাঁর লম্বা হরিণটিকে পিতার মতই স্নেহ করতেন। উইলিয়াম রুফাস শিকার করার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জমিদারদের খাওয়া-পরার কোন চিন্তা করতে হত না। কৃষিদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের ভার থাকত তাঁদের আশ্রিত প্রজাদের উপর। ভিলেন ও সার্ফের দলকে, ভাল হোক আর মন্দ হোক, যে জমি তারা পেত তাই-ই চাষ করতে হত। ছোট জানালা লাগানো কাঠের কুটিরে তারা বাস করত। এর ভেতরই উনান থাকত এবং এরই মধ্যে ধোঁয়ার মাঝখানে পোষ্য নিয়ে কৃষকদের দুঃখের সংসার চলত। কৃষকদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে থাকত কয়েকটা শূকর ও বলদ আর একটা দুধালো গাভী। ধনী কৃষকদের দু-একটা ঘোড়াও থাকত। শাকসবজি, মোটা রুটি, নিরামিষ ও কালভদ্রে মাংস ও টক মদ কৃষকরা খেত। মেয়েদেরও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত,—সবজি ফলানো, সুতো কাটা ও পশম তৈরী করে জামা-কাপড় বানানো ইত্যাদি অনেক কাজ তাদের করতে হত। কৃষকরা মোটা পশমের কাপড় অথবা চামড়ার তৈরী জামা পরত। ছোট ছেলেমেয়েরা মাঠে গরু ভেড়া চরাত, শস্যক্ষেত্রে পাখী তাড়াত। গ্রামে ছুতোর, কামার, মিস্ত্রী প্রভৃতি কিছু শ্রমিকও বাস করত। কৃষকদের অভাব-অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হত।

নবম পরিচ্ছেদ

ম্যানরে সার্ফদের দুঃখময় জীবন ঃ ম্যানরে কৃষকদের অবস্থা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করত—তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থা। কৃষক সার্ফ হয়েই জন্মগ্রহণ করত, কারণ ভূমিদাসত্ব তার বংশগত ছিল। সার্ফ ও মুক্তিপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহের ফলে জাত সন্তান সার্ফই হত, যদিও এই রকম বিবাহের ফলে স্বামীর মর্যাদা বাড়ত। ফিউডাল সমাজে দুরকম মুক্ত জনগণ ছিল যাদের ভূমিদাস থেকে পৃথক করা কঠিন ছিল। প্রথমতঃ শ্রমের বিনিময়ে যারা জমি গ্রহণ করত এবং দ্বিতীয়তঃ, যারা খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতিতে জমি গ্রহণ করত। শেষোক্ত জনগণ দ্রুত ভূমিদাসের পর্যায়ে নেমে যেত। কিছু জনগণ ছিল, যাদের 'ভিলেন' বলা হত, যারা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে জমি চাষ করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠ সার্ফদের থেকে এদের স্বতন্ত্র করে চেনা সহজ ছিল না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক আইনজ্ঞরা ভূমিদাসকে ক্রীতদাসের

পর্যায়ে ফেলেছিল। আইনতঃ ভূমিদাসরা ছিল প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং কোনও গৃহপালিত পশুর চেয়ে তাদের মর্যাদা কোন অংশেই উন্নত ছিল না। তারা কোনও সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে সার্ফকে ক্রীতদাসের মত বিক্রি করা হত এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে একজন ক্রীতদাসের দাম একটা ভাল ঘোড়ার চাইতেও কম ছিল। সমসাময়িক আইন অবশ্য তাকে 'ব্যক্তি'র মর্যাদা দিয়েছিল এবং সার্ফরা আদালতে স্বাধীন প্রজার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিতে পারলেও অন্য সার্ফের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারত। সার্ফের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল, সে ইচ্ছামত এক ম্যানর থেকে অন্য ম্যানরে বা শহরে যেতে পারত না। সাধারণ ভূমিদাস যে জমি চাষ করত তার বাইরে সে জমি চাষ করতে পারত না। অত্যাচারী প্রভুর জমি চাষ করা সার্ফের অসহ্য হলেও সে তার অবস্থার উন্নতি করতে সমর্থ ছিল না। সার্ফ যেমন জমি ছেড়ে যেতে পারত না, তেমনি তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করাও যেত না। জমিসহ ম্যানর অন্য প্রভুর কাছে বিক্রি হলে সেই জমির চাষী সার্ফও হস্তান্তর হত। সার্ফের জীবন দুর্বিষহ হলেও সে অন্ততঃ বেকার থাকত না। বিবাহ করতে হলে সার্ফকে প্রভুর অনুমতি নিয়েই তা করতে হত এবং এজন্য প্রভুকে করস্বরূপ কিছু অর্থ দিতে হত। ম্যানর-পদ্ধতিতে চাষীদের জীবনযাত্রা বংশানুক্রমিক, পশুতুল্য, হতাশাজনক ছিল। অভিজাতরা সার্ফদের সঙ্গে সামাজিক দিক থেকে কখনই মেলাবেশা করত না, তাঁদের কাছে সার্ফরা ছিল অস্পৃশ্য। যদিও খ্রীস্টান ধর্মাধিষ্ঠান ভগবানের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য সমতার নীতি প্রচার করেছিল, তা সত্ত্বেও এই চার্চই মানবসমাজকে যাজক, অভিজাত ও মানুষ—এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে ঘোষণা করেছিল যে মানুষের কাজ হচ্ছে প্রথম দুটি সম্প্রদায়কে তাদের শ্রম দিয়ে সেবা করা। সমাজের এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ চার্চের—অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্দেশে হয়েছিল বলে সে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত আর এই অবস্থার কোনও উন্নতি সম্ভব ছিল না। তখনকার সাহিত্য পাঠ করলে দেখা যায়, কৃষকদের গবাদি পশুরূপে অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কোনও অবস্থাতেই মধ্যযুগীয় সার্ফদের জীবন সুখপ্রদ ছিল না। অসংখ্য ধরনের খাজনা, বিভিন্ন কারণে অর্থপ্রদান, বাধ্যতামূলক শ্রম এবং চাষের জমিতে কঠোর পরিশ্রম তাদের জীবনে এনে দিয়েছিল চরম অভিশাপ। তাদের খাদ্য ছিল অপর্যাপ্ত, গৃহ ছিল আরামহীন এবং গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ছিল ভয়াবহ ও অকিঞ্চিৎকর।

দশম পরিচ্ছেদ

ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তির বিভিন্ন উপায়ঃ মধ্যযুগের ইউরোপের কৃষকরা ভূমিদাসত্ব থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছিল। এই ঘটনাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিগ্রো দাসদের মুক্তি এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আদেশে রুশ ভূমিদাসদের মুক্তির চেয়ে আরও চমকপ্রদ ঘটনা ছিল। অবশ্য ধর্মাধিষ্ঠানের নেতৃত্বে এই মুক্তি আসেনি, কারণ চার্চের আইনানুসারে সার্ফরা ছিল মালিকদের সম্পত্তি। যাজকদের মধ্যে কেউ কেউ সার্ফতন্ত্রের উচ্ছেদের পক্ষপাতী হলেও কয়েকজন বিশিষ্ট যাজক এই প্রথা চালু রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মাধিষ্ঠান একটি বলবান, বশীভূত ও অনুগত সম্প্রাদায়কে তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছিল। ধর্মাধিষ্ঠানের জমির ভূমিচাষীরা বার বার বিদ্রোহী হয়েছিল, কারণ তারা ধর্মাধিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে অনেক বেশী নির্যাতন ভোগ করছিল। এই সময় জমিদারদের ব্যক্তিগত যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে যাওয়ায় এবং বড় বড় জমিদার ছোট ছোট জমিদারকে গ্রাস করার ফলে পল্লী-অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল। ভাল রাস্তা ও নতুন সেতু তৈরীর ফলে এবং পুরাতন শহরগুলিতে শিল্প-বাণিজ্যের পূনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যাপকভাবে শুরু হয়। এইসব সুবিধাজনক অবস্থায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি হল। নতুন শহরগুলিতে কৃষিজাত পণ্যের অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দেওয়ায় ভূমিদাসরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে শুরু করল এবং এইভাবে মুক্তিপণও সংগ্রহ করে যেতে থাকল। তা ছাড়া, জঙ্গল পরিষ্কার এবং জলাভূমি থেকে জল নিষ্কাশন করেও ভূমিদাসরা প্রত্যেক দেশের সীমান্তে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে শুরু করল। ক্রমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হল। জমিদাররা দেখলেন, ভূমিদাসদের কাছ থেকে শ্রম ও উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থগ্রহণ অনেক বেশী লাভজনক। তাঁরা দেখলেন, ভাড়া করা দিনমজুর কাজে নিয়োগ করা অনেক লাভজনক, কারণ তাতে উৎপাদনের হার অনেক বেশী হয়।

এইসব পরিবর্তনের ফলে ভূমিদাসদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হল। অনেক ক্ষেত্রে প্রভুদের মুক্তিপণ দিয়ে ভূমিদাসরা স্বাধীন হত। অনেকে প্রভুর অনুমতি নিয়ে পবিত্র ধর্মীয় সংস্থায় যোগ দিত। অনেক ভূমিদাস আবার প্রভুর আশ্রয় থেকে পালিয়ে যেত। শহরেই পালিয়ে যাওয়া সহজ ছিল, কারণ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য শহরে বিকাশ লাভ করার ফলে কর্মের সংস্থান

শহরেই সহজ হত। পালিয়ে যাওয়া ভূমিদাস শহরের নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করতে থাকলেও তার সন্ধান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। ঝড়-ঝঞ্ঝা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশে বংশানুক্রমে কাজ করে ভূমিদাসরা বারবার তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করত, বিদ্রোহী হত। এইসব বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা হলেও সমাজে এগুলির ব্যাপক প্রভাব অনুভূত হয়। একাদশ শতাব্দীতে নর্ম্যান বিজয়ের সময় ইংলণ্ডের অনেক ভূমিদাস স্বাধীন হয়। এই শতাব্দীর শেষভাগে বহু ভূমিদাস ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেছিল। এই যুদ্ধে যোগ দিলে ভূমিদাসদের মুক্তি দিতে প্রভুরা সম্মত ছিল। দুঃসাহসিক গৌরবময় এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গলাভ নিশ্চিত, এই স্বপ্ন ভূমিদাসদের সামনে তুলে ধরা হল। ১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে 'কাল মহামারী' (Black Death) এবং 'শত বৎসরব্যাপী যুদ্ধে'র (Hundred Years War) প্রভাব ভূমিদাসদের মুক্তির সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল কয়ল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্লাণ্ডার্স, বোহেমিয়া এবং জার্মানীতে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের সকল মানুষের সমান অধিকারের মতবাদ প্রবল হয়ে উঠল। তারা পার্থিব ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল। ফলে ধর্মীয় সংস্থায় যুক্ত অনেক ভূমিদাস মুক্তিলাভ করল।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। সামন্ততন্ত্রের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কি সম্ভব ?
২। ঐতিহাসিক মেয়ার্স সামন্ততন্ত্রের কি সংজ্ঞা দিয়েছেন ?
৩। সামন্ততন্ত্র ইউরোপে কখন বিকাশ লাভ করেছিল ?
৪। ভিলেন কাদের বলা হত ?
৫। সার্ফ বা ভূমিদাস কারা ছিল ?
৬। মধ্যযুগে দুর্গগুলি কেন তৈরী হয়েছিল ?
৭। নাইট কাদের বলা হত ?
৮। মধ্যযুগে ব্যবহৃত একটি মারাত্মক অস্ত্রের নাম কর।
৯। মধ্যযুগের লোকেরা প্রধানতঃ কি কি ফল খেত ?
১০। মধ্যযুগের লোকেরা মিষ্টির বদলে কি ব্যবহার করত ?
১১। শিভালরি বলতে কি বোঝ ?
১২। ট্রুবেডার কাদের বলা হত ?
১৩। জগ্‌লাররা কি করত ?
১৪। তাইথ্‌ বলতে কি বোঝ ?
১৫। ক্যাপিটেশন কি ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা আলোচনা কর।
২ রাজার কাছ থেকে জমি গ্রহণকারীর প্রধান কর্তব্যগুলি কি ছিল ?
৩। 'সামন্তপ্রথায় সমাজ ছিল অনেকটা পিরামিডের মত'—আলোচনা কর।
৪। শার্লাম্যানের সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর বেসরকারী শাসন-ব্যবস্থায় কি দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল ?
৫। প্রভুকে শাসন-ব্যবস্থায় সাহায্য করার জন্য প্রজাকে কি কি কাজ করতে হত ?
৬। মধ্যযুগের দুর্গগুলি কিভাবে তৈরী হত ?
৭। মধ্যযুগীয় একটি দুর্গের বর্ণনা দাও।
৮। মধ্যযুগে সামরিক তৎপরতার জন্য 'নাইট' ও তাঁর অধীন ব্যক্তিগণ কি কি অস্ত্র ধারণ করতেন ?
৯। দেশরক্ষা ছাড়াও আর কাদের নাইটরা রক্ষা করতেন ?
১০। মধ্যযুগে চিকিৎসকের কাজ কারা করতেন ?
১১। মধ্যযুগে খাদ্যের প্রধান উপকরণ কি ছিল ?
১২। মধ্যযুগে জনসাধারণ কি কাপড়-চোপড় পরত ?
১৩। মধ্যযুগে জনগণের প্রধান আমোদ-প্রমোদ কি কি ছিল ?
১৪। শিভালরির সদস্য নাইটকে কি কি গুণের অধিকরী হতে হত ?
১৫। কয়েকজন ট্রুবেডারের নাম কর। তাঁরা কি ধরনের গান গাইতেন ?
১৬। ম্যানর পদ্ধতি কিভাবে উদ্ভূত হয়েছিল ?
১৭। পশ্চিম ইউরোপের কোন্ কোন্ অংশে ম্যানর পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেনি ?
১৮। ম্যানরের জমিতে কোন্ কোন্ ঋতুতে কি কি শস্য বোনা হত ?
১৯। কৃষকদের উপর খাজনা ধার্য করার জন্য অভিজাতরা কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন ?
২০। নির্ধারিত খাজনা ছাড়াও কৃষকদের কি কি অতিরিক্ত খাজনা দিতে হত ?
২১। ম্যানরবাসীদের ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২২। ম্যানরের ভূম্যধিকারীর গৃহে কি কি কাজ হত ?
২৩। ভূম্যধিকারীদের গৃহে অতিথিরা কিভাবে আপ্যায়িত হত ?
২৪। সামন্ত ও নাইটরা কিভাবে শিকার করতেন ?
২৫। সার্ফদের বাসগৃহ ও আহার্য কিরকম ছিল ?
২৬। সার্ফদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কি কি অসুবিধা হল ?
২৭। খ্রীস্টান ধর্মাধিষ্ঠানের দৃষ্টিতে সার্ফরা কিরূপ ছিল ?
২৮। সার্ফদের মুক্তির অর্থনৈতিক কারণগুলি আলোচনা কর।
২৯। সার্ফদের মুক্তির রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণসমূহ উল্লেখ কর।
৩০। সার্ফদের মুক্তির ধর্মীয় কারণসমূহ উল্লেখ কর।

বামদিকের শব্দগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে ডানদিকের শব্দগুলি সাজাও ঃ

নাইট	ফ্রান্সের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদল
ট্রুবেডার	খাস জমিদার
রাজা	সর্বনিম্ন সামন্ত
ম্যানর	সামন্তপ্রথার সর্বোচ্চস্তর

ভুল সংশোধন কর ঃ

(ক) সামন্তপ্রথা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।
(খ) নাইটরা অরাজকতার সৃষ্টি করতেন।
(গ) ভূমিদাসদের অবস্থা ভাল ছিল।
(ঘ) ভূমিদাসদের পালাবার কোন উপায় ছিল না।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। সামন্তপ্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
২। সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক বিভাগগুলি কি ছিল?
৩। ইউরোপ রক্ষায় মধ্যযুগের দুর্গগুলি ও বর্মপরিহিত ঘোড়সওয়ারদের ভূমিকা আলোচনা কর।
৪। মধ্যযুগে ইউরোপের জনসাধারণের খাদ্যবস্ত্র ও আমোদ-প্রমোদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫। শিভালরির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। ট্রুবেডারদের সমসাময়িক সাহিত্যে অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।
৬। ম্যানর পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
৭। ম্যানরে কৃষি-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৮। সামন্তপ্রভু ও চার্চকে কৃষকদের কি কি খাজনা দিতে হত?
৯। ম্যানরে যাজক, অভিজাত ও স্বাধীন প্রজাদের জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১০। ম্যানরের সার্ফদের দুঃখময় জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১১। ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তির বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা কর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্মযুদ্ধগুলিতে যোগদানের কারণঃ মধ্যযুগের খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীরা ইউরোপের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিদর্শন করে তাদের ধর্মীয় কৌতূহল চরিতার্থ করত এবং তাদের নিজেদের পাপ ও অন্যায়গুলির প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করত। তীর্থস্থানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল জেরুজালেম—যে জায়গায় যীশুখ্রীস্ট তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এই জেরুজালেম নগরেই যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এজন্য খ্রীস্টানরা প্রথমে জেরুজালেমকে ভগবানের অভিশপ্ত স্থান মনে করত। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের এই ধারণার পরিবর্তন হয়; জেরুজালেম ক্রমে খ্রীস্টানদের পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ইসলামের আধিপত্যের যুগে খ্রীস্টানদের এই পবিত্র তীর্থস্থান মুসলমানরা অধিকার করে। মুসলমানরা খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীদের মারধর করত, কখনও বা কারাগারে আবদ্ধ করে রাখত। তীর্থযাত্রীরা দেশে ফিরে সেই সব অত্যাচারের কাহিনী শোনালে খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটা আন্দোলন দেখা দেয়। পুণ্যভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য ইউরোপের খ্রীস্টানরা যে সব যুদ্ধ করেছিল ঐগুলিকে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। পোপ দ্বিতীয় আর্‌বান অযাজকীয় জনগণকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করতে বলেছিলেন। যীশুখ্রীস্টের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য রোমের পোপ বার বার ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। এতে ইউরোপের জনসাধারণ, ব্যবসায়ী শ্রেণী, জমিদাররা, এমনকি রাজারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপের বহু ধর্মযুদ্ধের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপের লোকেরা দলে দলে ক্রুসেডে যোগদান করেছিল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল অসৎ প্রকৃতির। লুটতরাজ করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমগ্র এশিয়া মাইনর তুর্কীদের অধীনে চলে গেলে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-পথগুলিও বন্ধ হয়ে গেল। ইউরোপের বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম হলে ইউরোপের মানুষ দলে দলে এসে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। কৌতূহলী মানুষরা অজানা দেশ দেখার উদ্দেশ্যে এবং 'সার্ফ' বা 'ভূমিদাস'রা তাদের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে দলে দলে ধর্মযুদ্ধে

যোগ দেয়। খ্রীস্টের জন্মের প্রায় এগারশ' বছর পর তুর্কীজাতীয় মুসলমানরা জেরুজালেম অধিকার করে। তুর্কীরা খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচার করছে, এরূপ একটা গুজব ইউরোপের সর্বত্র রটে গেল। ফলে রোমের পোপ এক মহাসভা আহ্বান করে ঘোষণা করলেন যে, বিধর্মীদের হাত থেকে পুণ্যভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করা প্রত্যেক খ্রীস্টানের কর্তব্য।

প্রথম ধর্মযুদ্ধ ঃ এই সময় পিটার নামে ফ্রান্সের একজন সন্ন্যাসী খালি পায়ে খচ্চরের পিঠে চড়ে ইউরোপের সর্বত্র জনগণকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন। প্রথম ধর্মযুদ্ধের মূলে ছিলেন পিটার। তিনি জেরুজালেমে তীর্থ করতে গিয়ে স্বচক্ষে খ্রীস্টানদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার দেখেছিলেন। পিটার হাজার হাজার সঙ্গী নিয়ে ধর্মযুদ্ধে বেরুলেন। প্রথম ক্রুসেডই সবচেয়ে সফল অভিযান। শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের একজন জেরুজালেম অধিকার করে (১০৯৯ খ্রীঃ)।

তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ ঃ খ্রীস্টানরা জেরুজালেম অধিকার করল বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন তাকে রক্ষা করতে পারল না। এর প্রায় নব্বই বছর পরে মিশরের সুলতান সালাদিন আবার জেরুজালেম অধিকার করেন। তখন জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য পোপ আবার ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটাই ছিল তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৭ খ্রীঃ)। এই ক্রুসেডে ইউরোপের বিখ্যাত রাজারা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ।

ফ্রেডারিক বার্বারোসার বয়স তখন ছিল সত্তরের উপরে। অনেক বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্টের পর জেরুজালেমের কাছে একটা পার্বত্য নদী পার হওয়ার সময় তিনি জলে ডুবে মারা যান। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড ছিলেন একজন যুদ্ধপ্রিয় বীরপুরুষ। এজন্য তাঁকে লোকে 'সিংহপ্রাণ রিচার্ড' আখ্যা দিয়েছিল। পোপের ডাকে রিচার্ড ক্রুসেডে যাবার জন্য একেবারে মেতে উঠলেন। পথের ব্যয়-সংগ্রহের জন্য তিনি অনেক শহরবাসীকে নানা-বিষয়ে স্বাধীনতার চার্টার দিয়েছিলেন। রিচার্ড বলতেন, "উপযুক্ত অর্থ পেলে আমি লণ্ডন শহরও বেচে দিতে রাজী আছি।"

চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ ঃ পোপ তৃতীয় ইন্নোসেণ্টের সময় চতুর্থ ক্রুসেডে বহু নাইট যোগদান করেন। তাঁরা জেরুজালেম অধিকার করে প্রচুর ধনসম্পদ লুট করেন। রোমান চার্চের বিশপরা গ্রীক চার্চের ধনসম্পদ লুট করেন। ভেনিসের

লোকরা এই ক্রুসেডে যোগদান করার ফলে এটা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পরে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে আর একটি ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ করতে এসে মিশরের সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের ফলে তুজনের মধ্যে মিত্রতা হয়। জেরুজালেমে খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে, বিনা যুদ্ধেই তার ব্যবস্থা করে ফ্রেডারিক দেশে ফিরলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ ও কৃষ্টিতে ধর্মযুদ্ধগুলির প্রভাব ঃ ধর্মযুদ্ধগুলি পশ্চিম ইউরোপের সমাজ ও কৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের সৃষ্টি করেছিল। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল। বহু ভূমিদাস ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে তাদের বন্ধন-মুক্তির সুযোগ পেয়েছিল। তা ছাড়া, এই সময় বহু শহরের উদ্ভব ও শিল্পের বিকাশের ফলে অসংখ্য সার্ফ ম্যানর থেকে সহজে পালাবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। ধর্মযুদ্ধগুলি স্ত্রীদের মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছিল, কারণ এইসকল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিকালে ভূমি-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাও তদারক করত।

পূর্বাঞ্চলের গ্রীক ও মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে পশ্চিম ইউরোপের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও বিশেষ পরিবর্তন হয়। পশ্চিম ইউরোপে পূর্বাঞ্চলের খাদ্য ও পণ্য-সামগ্রীর প্রচলন হয়। প্রাচ্যের অনুকরণে পশ্চিম ইউরোপের জনগণ লম্বা ঝুলওয়ালা জামা পরতে এবং লম্বা দাড়ি রাখতে শুরু করে। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে ইউরোপে ভুট্টা, চাল প্রভৃতি খাদ্য এবং লেবু, তরমুজ প্রভৃতি ফলের প্রচলন হল। তা ছাড়া, প্রাচ্যে ব্যবহৃত সুতীর কাপড়, মসলিন, কম্বল, কার্পেট প্রভৃতির প্রচলনও ইউরোপে হল। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে বিভিন্ন রং, ওষুধ, মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, আয়না, কাচ, সোনা ও রূপার উপর এনামেলের কাজ ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত হল। ইউরোপে চিনির চাহিদা এতই বৃদ্ধি পেল যে, এরপর থেকে দক্ষিণ ইউরোপে বেশী মাত্রায় আখ উৎপাদন হতে থাকে।

পশ্চিম ইউরোপে সামরিক কারণে ধর্মযুদ্ধগুলির গভীর প্রভাব দেখা দেয়। বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত তুর্গ এবং অবরোধ-কৌশল পশ্চিম ইউরোপে প্রবর্তিত হল। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে Cross-bow বা বিশাল ধনুক নাইট ও তাঁর ঘোড়ার জন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং সংবাদ-বহনকারী পায়রার প্রচলন ইউরোপে

শুরু হল। বায়ুচালিত যন্ত্রের কলকারখানা ধর্মযোদ্ধারাই সর্বপ্রথম দেখেছিলেন। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলেই গোল গম্বুজবিশিষ্ট ধর্মীয় স্থাপত্যের উদ্ভব হয়। পূর্বাঞ্চলের বিশাল গল্প-সঙ্কলন ধর্মযোদ্ধারাই ইউরোপে প্রচলন করেন। এই গল্প-সঙ্কলন পাশ্চাত্যের লেখকদের অনুরূপভাবে রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ধর্মযুদ্ধের আখ্যায়িকাগুলি থেকে ইতিহাস রচনায় অভূতপূর্ব উৎসাহ পাওয়া গিয়েছিল। চতুর্থ ক্রুসেডের পর অ্যারিস্টটলের কয়েকটি রচনা মূল গ্রীক ভাষা থেকে ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। চিকিৎসাক্ষেত্রে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের ফলে কয়েকজন চিকিৎসককে পশ্চিম ইউরোপে সাদর আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণের ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার এবং মানসিক উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী দুই শতাব্দীব্যাপী প্রাচ্য ভ্রমণের গুরুত্বপূর্ণ ফল পেয়েছিল। এর ফলে তাদের পূর্ব ইউরোপ ও প্রাচ্যের আভ্যন্তরীণ স্থল ও জলপথ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্ভব–কৃষি ও কুটিরশিল্পের পৃথকীকরণঃ ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে পশ্চিম ইউরোপ দ্রুত নগরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ভেনিস, জেনোয়া, পিসা এবং অ্যামাল্‌ফি প্রভৃতি শহর ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে লাভবান হয়। মার্শাই ও ক্যাটালোনিয়ার শহরগুলিও অসাধারণ উন্নতি লাভ করে। পশ্চিম ইউরোপে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর বাজার পূর্বাঞ্চলের ল্যাটিন রাজ্যগুলিতে ছিল না। পশ্চিম ইউরোপ পূর্বাঞ্চলের পণ্য-সামগ্রীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর এই অঞ্চল পূর্বাঞ্চলের পণ্য-সামগ্রীর অফুরন্ত বাজারে পরিণত হল। ইতালির শহরগুলির বাণিজ্যিক তৎপরতা আল্পস পর্বত অতিক্রম করে জার্মান, ফরাসী ও বেলজিয়ামের শহরগুলিতে প্রসারিত হল। চতুর্থ ক্রুসেডের পর পশ্চিম ইউরোপ ভূমধ্যসাগরে নৌ-আধিপত্য লাভ করল। এর ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যের মধ্যবর্তী কেন্দ্ররূপে কন্‌স্টানটিনোপলের অবসান হয়। এরপর ভেনিস ও জেনোয়ার জাহাজ নির্ভয়ে কৃষ্ণসাগরে বিচরণ করতে থাকে। এর ফলে রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার পণ্য-সামগ্রী বিনা বাধায় পশ্চিম ইউরোপে আমদানি হতে থাকে। প্রাচ্যে সৈন্য এবং পণ্য-সামগ্রী পাঠাবার জন্য বড় বড় জাহাজ

তৈরীর প্রয়োজনীতা অনুভূত হয়। ইংলণ্ড ইতালীয় এবং মুসলমানদের উন্নত নৌবিদ্যা বিশেষভাবে আয়ত্ত করে।

ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরভ্যুত্থান হল। পুরানো বাজারগুলি চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। শহরগুলিতে কৃষিজাত পণ্য-সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা ছিল; দূরবর্তী বাজারগুলিতেও এই চাহিদা দেখা দিল। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগের অবসানের পর এই প্রথম অতিরিক্ত শস্যের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রে বেশী সময় কাজ ও উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ করল, কারণ এর পর তাদের লক্ষ্য হল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এর আগে ভূমিদাসরা বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কৃষির কাজ করলেও শীতকালে কাঠ খোদাই, চামড়ার কাজ, কাপড় বোনা ও মাটির পাত্রাদি তৈরীতে ব্যস্ত থাকত। তাদের তৈরী এইসব জিনিস তারা ঘরে বসেই বা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত। এক দিকে চাষের জমির জন্য উৎপাদন বাড়াতে যেমন বেশী লোকের দরকার হল, তেমনি কুটিরশিল্পের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে এই শিল্পের জন্য আলাদা কারিগর সৃষ্টি হতে থাকল। এর ফলে কৃষি ও কুটিরশিল্প তখন থেকে আলাদা হয়ে গেল।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। মধ্যযুগে খ্রীস্টানদের সর্বাপেক্ষা প্রধান তীর্থস্থান কোন্‌টি ছিল ?
২। ফ্রেডারিক বারবারোসা কে ছিলেন ?
৩। দ্বিতীয় ফিলিপ কে ছিলেন ?
৪। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক কে ছিলেন ?
৫। 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ বলতে কি বোঝ ?
৬। পিটার হারমিট কে ছিলেন ?
৭। 'সিংহ প্রাণ' কে ছিলেন ?
৮। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে কি কি অস্ত্র ইউরোপে প্রচলিত হয়েছিল ?
৯। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে ইউরোপের কোন্‌ কোন্‌ শহরের উন্নতি হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। ধর্মযুদ্ধ কি ? এর উদ্দেশ্য কি ছিল ?
২। 'সার্ফ' বা ভূমিদাসরা ধর্মযুদ্ধে কেন যোগ দিয়েছিল ?

৩। ক্রুসেডে যাবার সময় রিচার্ড পথের ব্যয় সংগ্রহের জন্য কি করেছিলেন ? তিনি কি কথা বলেছিলেন ?
৪। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের বিবরণ দাও।
৫। ধর্মযুদ্ধের জন্য স্ত্রীজাতির মর্যাদা বেড়েছিল—যুক্তি দেখাও।
৬। ধর্মযুদ্ধের সময় ইউরোপে কি কি নূতন খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন হয়েছিল ?
৭। ধর্মযুদ্ধগুলির সময় চিকিৎসাশাস্ত্রের কি উন্নতি হয়েছিল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ধর্মযুদ্ধগুলিতে ইউরোপের জনসাধারণ কেন যোগ দিয়েছিল ?
২। ধর্মযুদ্ধগুলিতে ইউরোপের রাজাদের ভূমিকা আলোচনা কর।
৩। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে সমাজ ও কৃষ্টিতে কি প্রভাব দেখা দিয়েছিল ?
৪। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে কিভাবে ইউরোপে নূতন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল ?

সঠিক উত্তরটির পাশে '√' চিহ্ন দাও ঃ

(ক) নাইটরা ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেম/সিরিয়া/মিশর জয় করেন।
(খ) তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন পোপ দ্বিতীয় আরবান/পিটার হারমিট/ফ্রেডারিক বারবারোসা।
(গ) চতুর্থ ধর্মযুদ্ধে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট বহু নাইট নিয়ে জেরুজালেম/সার্ডিনিয়া/সিরিয়া দখল করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শহরের বিকাশ—ক্রুসেড ও গীল্ডের ভূমিকা ঃ একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফলে পুরানো রোমান এবং নতুন শহরগুলিতে প্রচুর জনসমাবেশ হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে শহরগুলির উৎপত্তির বহু কারণ ছিল। এদের মধ্যে কতকগুলি শহর মধ্য-যুগের রোমান শহরগুলির অবশিষ্ট রূপে অথবা নিগম (Guild—গীল্ড) নামে আদিম জার্মান শিল্প-বাণিজ্য সমিতিগুলি থেকে অথবা প্রাচীন স্থানীয় বাজারগুলি থেকে বিকাশ লাভ করেছিল। কোনও একটি নির্দিষ্ট কারণে শহরগুলি গড়ে ওঠেনি। শহরগুলির পরবর্তী ইতিহাসের মত উৎপত্তির ইতিহাসও সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণতঃ পুরানো রোমান শহরের অবশিষ্টাংশ রূপে অথবা ধর্মাধিষ্ঠান, মঠ ও দুর্গের সন্নিহিত অঞ্চল রূপে শহরগুলি বিকাশলাভ করেছিল।

বিশপদের শাসনকার্যের প্রধান কেন্দ্ররূপেও বহু শহরের উৎপত্তি হয়। ধর্মাধিষ্ঠানের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ভালভাবে পরিচালনার জন্য এবং যাজকদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী পাবার উপযোগী বাজার, কৃষিক্ষেত্রসংলগ্ন পল্লী বাড়ী, বিশপের ম্যানরে উৎপাদিত শস্যাদি মজুত করার গুদামঘর, একটি স্কুল এবং শাসনকার্যে ও সামরিক দায়িত্বে নিযুক্ত বিশপের কিছু ভূমিগ্রহণকারী প্রজা, কিছু ভৃত্য, কয়েকজন ক্ষুদ্র কারিগর এবং ম্যানরের কৃষিকার্যে নিযুক্ত অল্পসংখ্যক যুবকদের নিয়ে প্রথমত শহরের উৎপত্তি হয়েছিল। ধর্মীয় শহরগুলিতে ছিল আধা-ধর্মীয়, আধা-কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের বসতি। এরা ধর্মকর্মও করত, আবার চাষবাসও করত।

মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত এক-একটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহরের মধ্যে বহু ধর্মাধিষ্ঠান ও মঠের ভেতরে বহুসংখ্যক যাজক বাস করতেন। গ্রামাঞ্চলে মঠগুলি থাকার ফলে এগুলি নিকটবর্তী জনগণের বিপদের সময় আশ্রয়স্থল-রূপে ব্যবহৃত হত।

মধ্যযুগে অভিজাতদের দুর্গগুলিকে কেন্দ্র করেও কিছু শহরের উৎপত্তি হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী ও পরবর্তীকালের মত দুর্গগুলি বিরাট আকারের বা পাথর দিয়ে তৈরী ছিল না। শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি যাতে

ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেজন্য এই দুর্গগুলির ঘরগুলি কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। সমসাময়িক কাগজপত্রে এগুলিকে ক্যাস্‌ল (Castle—প্রাসাদ) না বলে (Berg—পরিবেষ্টিত জায়গা) এবং কোন-কোন সময় এগুলিকে—আর্ব্‌স্‌ (ল্যাটিন ভাষায় 'Urbs' কথার অর্থ বড় শহর) বলা হয়েছে। স্যাক্সনী, পূর্ব-জার্মান সীমান্ত এবং ইংলণ্ডে দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নর্সন্যান, ম্যাগিয়ার, স্লাভ ও স্যারাসানদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডিউক, কাউন্ট ও মারগ্রেভরা অসংখ্য বার্গ তৈরি করেছিলেন। বার্গ-সংলগ্ন অঞ্চল কেবল সামরিক কেন্দ্ররূপে নয়, কার্যতঃ স্বাধীন শাসনকর্তার অধীনে একজন 'ক্যাস্টেলান' উপাধিধারী এই অঞ্চল শাসন করতেন।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে পশ্চিম ইউরোপে অসংখ্য শহরের উন্নতি হয়েছিল এবং পূর্ব ইউরোপে বহু শহর গড়ে উঠেছিল। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় এবং জেরুজালেম যাবার পথে ধর্মযোদ্ধাদের খাওয়া-থাকার জন্য দোকানপাট, সরাইখানা ইত্যাদি স্থাপিত হয়। ক্রমে এগুলিকে কেন্দ্র করে অনেক শহর গড়ে উঠল।

একই কাজ বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকদের নিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বহু জায়গায় 'গীল্ড' গঠিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্যই 'গীল্ড' গঠন করেছিল। শহরের শিল্পী ও বণিকরা একসঙ্গে জীবন যাপন করত। এর ফলে সংঘবদ্ধ শহরগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে যে সকল বড় শহরের উৎপত্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে এণ্টোয়ার্প, অ্যামাল্‌ফি, কলোন, জেনোয়া ও ভেনিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে শহরগুলির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি এত বাড়ল যে সেখানকার মানুষ স্বাধীন রাষ্ট্রের মত নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা চালাত। কোন কোন শহরে বিত্তশালী পরিবাররা রাজাদের মত ক্ষমতা অধিকার করে বসত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শহর-জীবনের বিবরণ ঃ শহরের প্রধান ফটকের বাইরে ফাঁসি কাঠে দু-একটি মৃতদেহ প্রায়ই ঝুলে থাকতে দেখা যেত। কোন-কোন শহরের ফটকের উপর লোহার শলাকায় অপরাধীদের কাটা মাথা গাঁথা থাকত। এগুলি বিদ্রোহীদের দাবিয়ে রাখার জন্য করা হত। জলপূর্ণ বা জলশূন্য গভীর পরিখা শহরের প্রাচীর ঘিরে খনন করা হত। প্রাচীরের উপরে তিনশ' ফুট

দূরে দূরে এক-একটা গম্বুজ ছিল। প্রাচীরের প্রবেশপথ দিয়ে শহরের ভিতরে যেতে হলে পরিখার উপরের হাতে টানা সেতু (ড্র-বীজ) অতিক্রম করতে হত।



মধ্যযুগের শহরগুলি আজকালকার শহরের চেয়ে অনেক ছোট ছিল। এগুলিতে বহু লোক ঘেঁষাঘেঁষিভাবে বাস করত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্যালারমোর লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলান শহরগুলির প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা ছিল সম্ভবতঃ এক লক্ষ। এই শতাব্দীতেই প্যারিসের জনসংখ্যা এক লক্ষ থেকে বেড়ে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারে দাঁড়ায়। শহরের বাড়ীগুলি দেখতে ভাল ছিল না এবং এগুলি তৈরী হত খুব ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে। মধ্যযুগে অধিকাংশ বাড়ীই ছিল কাঠের তৈরী। ফলে আগুন লাগার ভয় ছিল, অথচ জলের ভাল ব্যবস্থা ছিল না।

মধ্যযুগে শহরবাসীরা যে খুব সুখে থাকত তা নয়। রাস্তাগুলি ছিল সরু ও পাথর দিয়ে বাঁধানো। বেশির ভাগ রাস্তাই দশ ফুট বা আরো কম চওড়া ছিল। অবশ্য পল্লী-অঞ্চল থেকে পণ্য-বোঝাই ঘোড়ায় টানা গাড়ী রাস্তায়

চলার মত প্রশস্ত ছিল। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা সর্বপ্রথম ইতালিতে তৈরী হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফিলিপ অগাস্টাসের সময় সর্বপ্রথম প্যারিসের এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে জার্মানীর প্রধান শহরগুলির রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়। অবিরত বৃষ্টির জল পড়ে রাস্তাগুলি পিচ্ছিল হত। জল-নিকাশের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। দু'ধারের দোতলা বাড়ীর বারান্দাগুলি প্রসারিত হয়ে উপরের দিক থেকে রাস্তা প্রায় ঢেকে ফেলত। ফলে রাস্তায় সূর্যের আলো সহজে পড়ত না। অধিকাংশ সময় রাস্তাগুলি দুর্গন্ধ ও আবর্জনাপূর্ণ থাকত।

প্রধানত চোর-ডাকাতের ভয়েই সেকালের শহরগুলি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। রাত্রিকালে শহরে প্রবেশ করার প্রধান ফটকগুলি বন্ধ করে দেওয়া হত। রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ছিল না। কেবল বড় বড় হোটেলের মালিকরা দরজার সামনে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখত। চৌকিদাররা রাত্রিতে পাহারায় বেরোবার সময় লম্বা লাঠির মাথায় জ্বলন্ত লণ্ঠন বেঁধে রাখত। চৌকিদাররা সকলেই ছিল প্রায় বৃদ্ধ; চোর-ডাকাতরা এদের আদৌ ভয় করত না। 'টোল' বা 'কর' না দিয়ে ভ্রাম্যমাণ বণিকরা শহরে প্রবেশ করতে পারত না। পরবর্তীকালে এক শহর থেকে অন্য শহরে মালপত্র নিয়ে যেতে গেলে বা দোকানে জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখতেও নানারকম কর দিতে হত।

শহরে তাঁতী, ছুতোর, মুচি, কামার, কুমোর প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের নিয়ে পৃথক পৃথক 'নিগম' গঠিত হয়েছিল। নিগম যে নিয়মকানুন রচনা করত তা নিগমের অন্তর্ভুক্ত সকলকেই মেনে চলতে হত। দোকানদার ভেজাল জিনিস বিক্রি করলে অথবা রবিবারে, পর্বদিনে কিংবা রাত্রিকালে কাজ করলে নিগম শাস্তির ব্যবস্থা করত। সেকালে শহরে বাজিকরের খেলা, কুকুরের দৌড়, মোরগের লড়াই, নানারূপ অভিনয় প্রভৃতি ক্রীড়া-কৌতুকের অভাব ছিল না। শহরের মেয়র বা শাসনকর্তা এবং তাঁর অনুচরেরা যখন জমকালো পোশাক পরে রাস্তায় বের হতেন তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্মান জানাত।

শহরগুলির স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা পুরানো ধাঁচের ছিল। যে শহরগুলি নদীর তীরে ছিল না সেখানকার পানীয় জল কেবল কুয়া থেকে সংগ্রহ করা হত। কুয়ার জল দূষিত হওয়ার ফলে কোন কোন সময় প্লেগ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব হত। এই শহরগুলিতে, স্বাভাবিক মৃত্যুর হার আধুনিক যুগের শহরের চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শহরের স্বাধীনতালাভে রাজকীয় সনন্দ ঃ বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তি ঃ রাজকীয় ক্ষমতা অপহরণ করে জমিদাররা সামন্ততান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সে যুগ শেষ হবার পর শান্তিপূর্ণভাবে এবং ধীরে ধীরে উত্তর ইতালিতে বহুক্ষেত্রে 'বার্গে'র লোকেরা তাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে থাকে। পরে এই ক্ষমতা অর্জনের স্বীকৃতি একটি সনন্দ বা সন্ধিপত্র দ্বারা তারা আদায় করেছিল। যেভাবে রাজা ও সামন্তরা একটি সেনাবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে অথবা রাজনৈতিক সমর্থনলাভের আশায় তাদের ভূমি ইজারা দিতেন, সেইভাবেই দূরদর্শী রাজা, অভিজাতরা, যাজক ও অ্যাবট্রা শহরের স্বাধীনতা আন্দোলন (যে আন্দোলন দমন করা তাঁদের সাধ্যাতীত ছিল) থেকে সবচেয়ে লাভ পাবার আশায় বহু শহরকে স্বাধীন হবার সনন্দ দিয়েছিলেন। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের জন্য রাজা, অভিজাত ও ধর্মযাজকদের যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত তেমনি যুদ্ধ ও ঘরোয়া বিবাদের জন্যও তাঁদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত। সেজন্য টাকা পেলে তাঁরা শহরগুলির উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ত্যাগ করতেন। শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলে বণিক ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে বলে এই অঞ্চলে, বিশেষভাবে উত্তর ও মধ্য ইতালিতে, দক্ষিণ ফ্রান্সে, রাইন অঞ্চলে ও ফ্লাণ্ডার্সে বহু স্বাধীন শহর গড়ে উঠেছিল। ইংলণ্ড ও উত্তর ফ্রান্সে শক্তিশালী রাজতন্ত্র শহর স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন বাড়তে দেন নি। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড কিন্তু অনেক শহরের স্বায়ত্তশাসনের সনন্দ বিক্রি করে শহরবাসীদের কাছ থেকে ক্রুসেড যাত্রার অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

মধ্যযুগে শহরগুলির প্রায় সবকটিই দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হত। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত শহরকে 'বার্গ' বলা হত। পরবর্তীকালে যে সকল ব্যবসায়ী, শিল্পী, ভূমিদাস শহরে বাস করার উদ্দেশ্যে আসত তারা অভিজাত শ্রেণীর ছিল না। শহরের বাসস্থানের অভাব থাকায় তারা 'বার্গে'র দেওয়ালের বাইরে বসবাস করতে বাধ্য হত। এইভাবে শহরের বাইরে বসবাসকারী আগন্তুকরা যে অঞ্চলে বাস করত তাকে 'ফাউবার্গ' (বার্গের বাইরে) বা 'সাবার্ব' (শহরতলী) বলা হত। পূর্বতন শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর আগের সীমানা সম্প্রসারিত করা হত। এরপর শহরের নতুন বাসিন্দারা 'ফাউবার্গস্' বা 'বার্জেসেস্' নামে পরিচিত হল। পরবর্তীকালে এই 'বার্জেসেস্' কথাটি থেকে 'বুর্জোয়া' কথাটি এসেছে। 'বুর্জোয়া' কথার অর্থ হল শহরের অধিবাসী। এভাবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে মধ্যবিত্ত

বা তৃতীয় শ্রেণীর (Third Estate) উদ্ভব হল। এরা স্বাধীন বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকে প্রচুর উপার্জন করত। কিন্তু সমাজে যথাযোগ্য স্থানলাভে তখনও এরা বঞ্চিত ছিল। পরবর্তীকালে এই বুর্জোয়া শ্রেণী ফরাসী বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম ইউরোপে এক বিশেষ ঘটনা।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'টাউন' বলতে কি বোঝা যায় ?
২। 'বার্গ' কথাটির অর্থ কি ?
৩। 'বুর্জোয়া' বলতে কি বোঝায় ?
৪। ইউরোপে মধ্যযুগে কিরূপে শহরগুলির সৃষ্টি হয়েছিল ?
৫। ইউরোপের শহরগুলিতে আমোদ-প্রমোদ কি ধরনের ছিল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। মধ্যযুগে ইউরোপে শহরগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছিল ?
২। শহরগুলির উৎপত্তি ও বিকাশে ক্রুসেড ও 'গীল্ডে'র ভূমিকা আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'শহরগুলি ধর্মযুদ্ধের জন্যই তৈরী হয়েছিল'—এ কথার অর্থ কি ?
২। 'গীল্ড' কি ? 'গীল্ড'গুলি গঠনের পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল ?
৩। মধ্যযুগীয় শহরগুলিতে রাস্তার অবস্থা কেমন ছিল ?
৪। মধ্যযুগের বাজার কিরকম ছিল ?
৫। মধ্যযুগের ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত শহরের নাম কর।
৬। শহরগুলি কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ?
৭। মধ্যযুগে বড় বড় শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
৮। শহরগুলিতে জলের ব্যবস্থা কি ছিল ?

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। 'টোল' বলতে কি বোঝায় ?
২। 'ফাউবার্গ' কি ?
৩। 'ড্র-ব্রীজ' কি ?
৪। 'ক্যাস্টেলান' কি করত ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। একই কাজ বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকদের নিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বহু জায়গায় —— গঠিত হয়েছিল।
২। ল্যাটিন ভাষায় **Urbs** কথার অর্থ ——।
৩। শহরের কাছে বসবাসকারী আগন্তুকরা যে অঞ্চলে বাস করত তাদের —— বা —— বলা হত।

(ক) চীন (৭০০-১৪০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাঙ যুগে (৬১৮-৯০৬ খ্রীঃ) চীনদেশের ঐক্যবদ্ধতা এবং এই যুগের আইনকানুন ও শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ঃ এই অধ্যায়ে আমরা চীন ও জাপান সম্পর্কে আলোচনা করব। চীনে সুই বংশীয়দের পতন যখন আসন্ন হয়ে উঠল তখন সম্রাটের সেনাপতি লি ইউয়ান বিদ্রোহী হয়ে সিংহাসন অধিকার করলেন। লি ইউয়ান তাঙ বংশের প্রথম সম্রাট ছিলেন। হান বংশের পতনের চার শতাব্দীর পর চীন পুনরায় অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র-নীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। পরবর্তী শাসক তাই-সুং ছিলেন একজন সুদক্ষ যোদ্ধা। তাঁর পক্ষে দিগ্বিজয়ী অভিযান ছিল স্বাভাবিক। তাঁর এই অসামান্য সাফল্যের কারণ নিজের কর্তৃত্বাধীনে চীনাবাহিনীর পুনর্গঠন এবং যুদ্ধোপকরণের উন্নতি দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি। পূর্ব মঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার খিতান জাতি চীনের বশ্যতা স্বীকার করল। এই সময় কাশগড়, ইয়ারখন্দ, সমরখন্দ ও বোখারা চীনের পদানত হয়েছিল। তাই-সুং-এর মৃত্যুকালে পশ্চিমে রুশ-তুর্কীস্তান ও দক্ষিণে আফগানিস্তান সমেত সমগ্র ভূখণ্ডে চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। তাই-সুং-এর পুত্র কাও-সুং পিতার অধিকৃত মধ্য-এশিয়া চীনের আয়ত্তাধীন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমনকি পশ্চিমে তুর্কীদের নির্মূল করে সাম্রাজ্যের পরিধি আফগানিস্তানের অক্সাস নদীর পরপারে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। এই বংশের অপর একজন শাসক সম্রাট মিং হুয়াং চীনের পশ্চিমদিকের দেশগুলিতে তুর্কী ও তিব্বতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঙ সাম্রাজ্যের মত এত বড় আয়তনের ভূখণ্ড চীনের ইতিহাসে আর কোন রাজবংশের রাজত্বকালে দেখা যায় নি। আয়তন বা জনসংখ্যায় তাঙদের অধীন চীন সাম্রাজ্য ছিল সেকালের পৃথিবীতে বৃহত্তম।

সম্রাট তাই-সুং একদা কারাগার পরিদর্শনকালে দেখলেন যে ২৯০ জন দণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুর অপেক্ষায় কাল যাপন করছে। তিনি তখনই তাদের কৃষিকাজ করবার জন্য মাঠে পাঠালেন। তাদের কাছ থেকে কেবল এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে মাঠের কাজের পর তারা আবার কারাগারে ফিরে আসবে। তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল ; সেজন্য সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট

তাদের মুক্তিও দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই নিয়ম হল যে কোন লোকের মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করার আগে সম্রাট তিনদিন উপবাসী থেকে চিন্তা করে দেখবেন যেন কোনও অন্ধ আবেগে বা ভুলবশত কোনও নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি না পায়। কারাগারের কয়েদীদের দুঃসহ জীবনে তিনি এনেছিলেন বৈচিত্র্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি কয়েদীদের দণ্ডাদেশ হ্রাস বা মকুফ করেছিলেন। মন্ত্রীরা যখন সম্রাটকে দস্যুবৃত্তি দমনের জন্য কঠোর আইন চালু করার উপদেশ দিলেন তখন তিনি বললেন, "কঠোর শাস্তির চেয়ে দস্যুতা নিবারণের আরও ভাল উপায় রাষ্ট্রের ব্যয় হ্রাস, করভার কমানো, সাধু কর্মচারী নিয়োগ ; মোট কথা প্রজাদের খাওয়া-পরার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।" সম্রাট সুয়াং-সুং প্রাণদণ্ড মকুফ করা ছাড়া কারাগার ও আইন-আদালতেরও সুব্যবস্থা করেছিলেন। তাঙ যুগে সুনির্দিষ্ট আইনকানুন রচনা করে চীন সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঙ যুগের এক বিশেষ অবদান আছে। তাঙ যুগের শিক্ষাকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল এবং যাতে সাম্রাজ্যের সব ক্ষেত্রে মেধাবী কর্মচারী নিযুক্ত হয় সেজন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাঙ যুগের সাহিত্য (কবিতা), চা-পান, ছাপাখানা ও শিল্পকলা ঃ তাঙ যুগের তিন শতাব্দীকে 'কাব্যের স্বর্ণযুগ' বলা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে পদ্য রচনাই ছিল এ যুগে প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়। তাঙ যুগের কাব্য সংগ্রহের দশটি গ্রন্থে চার হাজার দু'শ কবি-রচিত আটচল্লিশ হাজার কবিতা স্থান পেয়েছে এবং তিন হাজার কবির নাম উল্লেখ আছে। চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-রূপে লি-পো ছিলেন অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী। মানবজাতি ও প্রকৃতি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল। লি-পোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাস্তবতা। কবি হিসাবে তিনি কখনই বাস্তবকে উপেক্ষা করেননি। এই যুগে অনেক ছোট গল্প রচিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি লেখা হয়েছিল কঠিন পণ্ডিতী ভাষায়, সুতরাং সেগুলি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারত না। এই যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকদের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—একজন দার্শনিক চ্যাং-চিহো, অন্যজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ হ্যান-ইউ।

চীনে চা-পান আরম্ভ হয়েছিল বহু পূর্বে, ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দে। দক্ষিণাঞ্চল থেকে ক্রমশঃ উত্তরাঞ্চলে চীনে চায়ের ব্যবহার চালু হয়েছিল। 'চা' শব্দটি

চীনা। বারবার চা-পানের মাহাত্ম্য কীর্তন করে কবিরা কবিতা লিখত হাজার হাজার। ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে জনৈক লেখক 'চা-সাহিত্য' নামক গ্রন্থে এই কবিত্বপূর্ণ বর্ণনাটি দিয়েছেন—"সবচেয়ে ভাল চা-পাতার ভাঁজ অশ্বারোহীর বুট জুতোর ভাঁজের মত।"

তাঙ যুগে সাহিত্য রচনার বিপুল উদ্যম সম্ভব হয়েছিল বই ছাপার কল্যাণে। এই যুগে চীনা যান্ত্রিক উদ্ভাবন মুদ্রণ-প্রণালীর উন্নতি করে বই ছাপার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। সরকারী উদ্যোগে রাজবংশের বৃহৎ ইতিহাসগুলিও ছাপা হল। প্রথমে কাঠের ব্লক দিয়ে বই ছাপা হত, ক্রমে মাটির তৈরী অক্ষর এবং মোঙ্গল আক্রমণের আগেই ধাতুর তৈরী অক্ষর ব্যবহার করা হত। ছাপানো বইগুলি যে কেবল বিদ্বানদেরই উৎসাহদান করেছিল তা নয়, জনসমাজে শিক্ষাবিস্তার করে বইগুলি সে যুগের চীনা-সংস্কৃতিকে জগতে অতুলনীয় করে তুলেছিল।

তাঙ যুগের শিল্পীরা চিত্রাঙ্কন ও পর্সিলিন (চীনামাটির বাসনপত্র) শিল্পেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এই যুগের চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত শিল্প নষ্ট হয়নি। সে যুগের চিত্রকররা নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু, জীবজন্তু প্রভৃতিও আঁকতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাঙ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার ঃ তাঙ যুগে চীনের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ বেড়ে যাবার ফলে বিদেশীদের সমাগম হয়েছিল আগের চেয়ে অনেক বেশী, ব্যবসা-বাণিজ্যও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিদেশে যাওয়া চীনা বণিকদের চেয়ে চীনে বিদেশী বণিকদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। বিশাল চীনদেশে নিজেদের অভাব পূরণের যথেষ্ট সুযোগ চীনাদের ছিল। এজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাদের কদাচিৎ বিদেশ যাত্রার প্রয়োজন হত। রাজধানী চাং-আন (বর্তমান সিয়ান ফু) ছিল চীনে প্রবেশ-পথের প্রধান ঘাঁটি। এই শহরের মধ্য দিয়ে পণ্য দ্রব্যাদির আনদানি-রপ্তানি চলত। পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের মানুষের মিলনক্ষেত্ররূপে এই শহরটি বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

দক্ষিণে সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ছিল প্রভূত। অষ্টম শতাব্দীতে সেই বাণিজ্য ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বড় বড় জাহাজে করে পণ্যদ্রব্যাদি নিয়ে পারস্য, আরব ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চীনে এল। তখন আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সরকারী দপ্তর খোলা হল।

ইসলামের অভ্যুত্থানের ফলে সমুদ্রপথে দূরপ্রাচ্যে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা ক্যান্টনে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যে চীনা রেশমের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় ভারতবর্ষেও যে চীনা রেশম রপ্তানি হত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রপ্তানির অপর দুটি প্রধান সামগ্রী ছিল মসলা ও চীনামাটির বাসনপত্র (porcelain)। বিদেশ থেকে আমদানি হত হাতীর দাঁত, ধূপ, তামা, কাছিমের খোলা এবং গণ্ডারের শিং। তাঙ যুগে চীনারা সমুদ্রপথে কদাচিৎ বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত।

প্রথম তাঙ সম্রাট এরূপ একটি পরিকল্পনা অনুসারে জমি পুনর্বণ্টন করেছিলেন যাতে প্রজারা সমপরিমাণ জমির দখলদার হয়। বেচা-কেনার মারফত বৃহৎ জমিদারি গঠনের উদ্যোগ ব্যর্থ করার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। সরকারী উদ্যোগে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল, চীনে কয়েকবার দুর্ভিক্ষও দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় সরকার থেকে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হত এবং প্রজাদের খাজনাও মকুফ করা হত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাপান, কোরিয়া ও আনামে চীনা সভ্যতার বিস্তৃতি: চীনা সভ্যতার স্বরূপ : খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় সমগ্র চীনে বিস্তার লাভ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ ও সঙ্ঘারাম তৈরী হয়। এই সময় চীনে বিভিন্ন দেশ থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু আসতেন। ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির পথে তখনও বৌদ্ধ শ্রমণরা চীনদেশে অনবরত আসতেন। এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে চীনে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। চীনের তাওপন্থীরা মুষ্টিযোগ, ভেষজ-চর্চা, স্পর্শমণির সন্ধান এবং 'সঞ্জীবনী রসায়নে'র গবেষণা করতেন। তাঁরা চুম্বক, কম্পাস প্রভৃতি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলেন।

সম্রাটরা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে তাও বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু রাজ্যশাসন ব্যাপারে কনফুসীয় ধর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না। রাজকর্মচারীরা বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সুযোগ পেলেই বৌদ্ধধর্মের উপর নির্যাতন করতেন। ৬২৬ খ্রীস্টাব্দে বৌদ্ধ ও তাও ধর্মের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও চীনের সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্ম যে আসন লাভ করেছিল তার স্থায়িত্ব এবং মর্যাদা আজ পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়নি।

কোবিয়া, জাপান, আনাম প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির উপর চীনা সংস্কৃতির, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কথা, উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোরিয়া চীনের সামরিক শক্তিকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেও সেই দেশ চীনের সংস্কৃতিকে এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে পরম আদরে বরণ করে নিয়েছিল। তাঙদের সাংস্কৃতিক প্রভাবের গণ্ডীর মধ্যে ইন্দোচীন ও তিব্বতী ধর্মেও চীনের বৌদ্ধদের ভাবধারা অনুপ্রবেশ করেছিল। সুই বংশীয়দের সময় থেকেই জাপানে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ক্রমে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনের সংস্কৃতির নূতন নূতন ভাবধারা ও চিন্তার প্রসারণের ফলে 'নারা যুগে'র জাপানী সাহিত্য, শিল্প ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছিল।

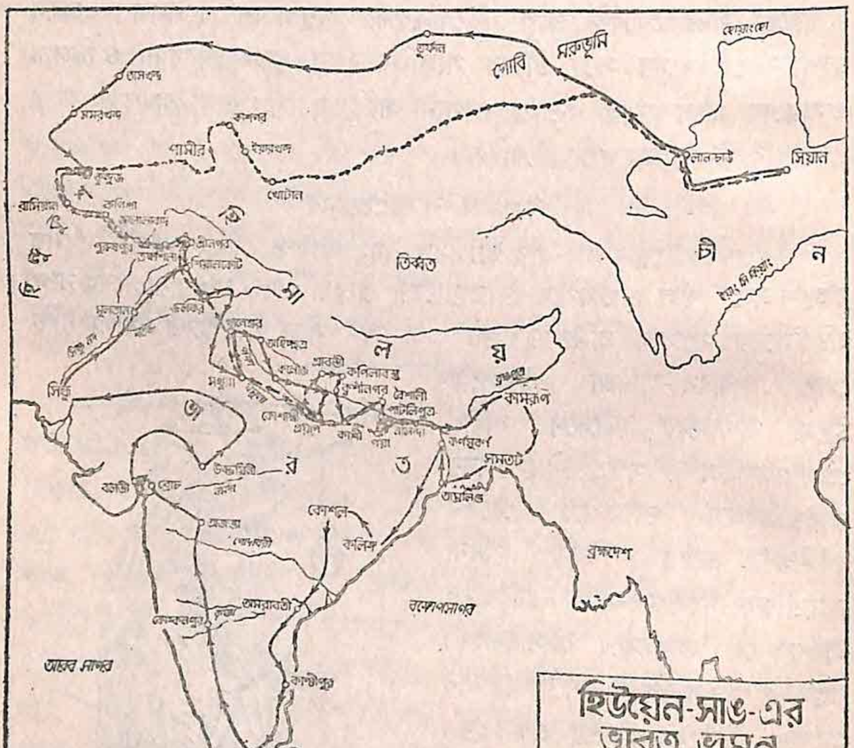
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতে হিউয়েন-সাং-এর আগমন এবং ভারত থেকে প্রর্ত্যাবর্তনের ফলাফল ঃ স্থল ও জলপথে যাতায়াতের সুবিধা বেড়ে যাওয়ায় চীনের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হল এবং সেই সঙ্গে বিদেশীদের সমাগম বৃদ্ধি পেল। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে চীনের বণিকদের বিদেশে যাবার প্রয়োজন ছিল না সত্য, কিন্তু চীনের পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে যেতেন ধর্মশিক্ষার জন্য। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকে হোনান প্রদেশে হিউয়েন-সাং-এর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত রাজকর্মচারীর পুত্র। চার ভাই-এর মধ্যে উনিই ছিলেন সবচেয়ে ছোট। ওঁর এক দাদা ছিলেন বৌদ্ধ শ্রমণ; তাঁরই প্রভাবে কুড়ি বছর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন এবং চীনা ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন।


হিউয়েন-সাং

বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্যে সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করে ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি

চীন ত্যাগ করেন। দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে গোবি মরুভূমি, তুন্ হুয়ান, তুরফান অতিক্রম করে তিয়েনসান পর্বতের উত্তর দিক দিয়ে ইস্ফ্কুল হ্রদের কিনারা ঘেঁষে তাস্খন্দে পৌছলেন। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে সমরখন্দ, বালঘ্, কাবুল হয়ে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে উপনীত হন। প্রায় ষোল বছর (৬২৯-৬৪৫ খ্রীঃ) একাদিক্রমে এদেশে থেকে তিনি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ



করেন। এর মধ্যে প্রায় আট বছর তিনি হর্ষবর্ধনের রাজ্যে অবস্থান করেন এবং দু বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ভারতে তিনি বৌদ্ধদের অনেক পবিত্রভূমি পরিদর্শন করেন, নানা সঙ্ঘারামে ধর্ম শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনা করেন, অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। স্থলপথে তিনি স্বদেশে ফেরেন। ভারতে থাকার সময় তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে মনোরম তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে সমসাময়িক ভারত সম্বন্ধে অনেক

কথা জানা যায়। ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে এর বিশেষ মূল্য আছে। ভারত থেকে ফিরে আসার সময় অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। জীবনের অবশিষ্ট কুড়ি বছর তিনি অধ্যাপনা ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের সবগুলি মিলিয়ে আকারে খ্রীস্টীয় বাইবেলের প্রায় পঁচিশ গুণ। এই গ্রন্থগুলি বৌদ্ধধর্মকে একান্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এজন্য তিনি যথেষ্ট রাজসম্মানও পেয়েছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর মৃত্যুর পর অপর একজন চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিং ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন এবং অনুবাদের জন্য অসখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে চীনে ফিরে গিয়েছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুং যুগের শাসনকাল (৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ) ঃ সুং বংশীয়দের শাসনকালে চীনের খণ্ড-বিক্ষিপ্ত প্রদেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যের এই ঐক্যসাধনে কোনও বলপ্রয়োগ করতে হয়নি। প্রদেশগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি শান্তির পরিবেশে সহাবস্থান ছিল এবং এগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের চেতনাও প্রসার লাভ করেছিল। সুং যুগে চীনে কোন গণবিদ্রোহ দেখা যায়নি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুং বংশীয় শাসকদের দ্বারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হয়েছিল। আগে চীনের প্রচলিত প্রথা অনুসারে প্রদেশগুলি থেকে শস্যকর সংহীত হয়ে কেন্দ্রে পাঠানো হত। পরিবহণের অসুবিধা ছাড়াও এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। রাজধানীতে প্রচুর শস্য জমা হবার ফলে শস্যের দাম খুব কমে যেত যার ফলে খুব কম দামে এই শস্য বিক্রি করতে হত। আর দূর দূর প্রদেশে খাদ্যের অভাব থাকায় খাদ্যশস্যের দাম খুব বেড়ে যেত। এইসব অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে সম্রাট সেন-সুং-এর মন্ত্রী ওয়াং আন-সি প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব শস্যগোলা স্থাপন করলেন। তিনি কর হিসাবে পাওয়া শস্য প্রতিটি জেলায় মজুতের ব্যবস্থা করলেন। শস্যের ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানি রাষ্ট্রীয়করণের ফলে রাষ্ট্রের লাভ হল। কৃষকও তার উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রি করে ন্যায্য দাম পেল।

সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদের বাঁচাবার জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের কৃষি-ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছিল। জমি বন্ধক রেখে কৃষকরা কৃষি আরম্ভের

সময় বার্ষিক ৩৩·৩% হার সুদে ঋণ নিত এবং সুদসমেত এই ঋণ পরিশোধ করত শস্য কাটার পর।

সুং যুগে সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে নতুনভাবে কর ধার্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। জমিগুলি জরিপ করার কারণ ছিল যাতে সমস্ত জমির উপর ন্যায্য কর ধার্য করা হয়।

শিল্প ও সাহিত্য ঃ সুং যুগ নানাবিধ পদ্য রচনা, প্রবন্ধ এবং বিশেষভাবে ইতিহাস রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন জুমা-কুয়াং। এই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা ছিল 'বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia)। এই ধরনের রচনা অবশ্য ইতঃপূর্বেও দেখা গিয়েছিল কিন্তু সুং যুগের বিশ্ব-কোষগুলি ছিল বিশেষ ধরনের। সুং যুগে নানা বিষয়ে ছোট-বড় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাঙ যুগের কবিরা ছিলেন পেশাদার কিন্তু সুং যুগের পণ্ডিতরা রাজকার্য ও ধর্মচর্চার অবসরে কবিতা লিখতেন। বাছাই করা গল্পগুচ্ছ 'কুয়াং-চি' নামে গ্রন্থ সুং যুগের গোড়াতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

সুং যুগে ইতিহাস, পদ্য ও গদ্য রচনা ছাড়াও এই যুগে জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, উদ্ভিদবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রেও নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ফল-ফুলের একখানি চমৎকার গ্রন্থে লেবুজাতীয় ফলের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। কথ্য ভাষায় কথা-সাহিত্যের সূচনা সুং যুগে হয়েছিল। সুং চিত্র-শিল্প উৎকর্ষের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল; প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনই সুং শিল্পনিষ্ঠার আদর্শ হয়ে উঠেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইউয়ান বংশ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ) ঃ মোঙ্গলদের ইতিহাস ঃ কুবলাই খাঁ ঃ মোঙ্গলরা ছিল তুর্কী জাতির অন্তর্গত একটি উপজাতি। মোঙ্গল ও তুর্কী—এই দুটি জাতির ভাষাগত সাদৃশ্য ছিল। মোঙ্গলরা কেবল চীনের এক ক্ষুদ্রাংশ অধিকার করেই সন্তুষ্ট থাকেনি। পশ্চিমে মধ্য-এশিয়া অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর, সিন্ধুনদ ও পারস্য উপসাগর—এই বিশাল ভূখণ্ডব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল যার তুলনা আজও পাওয়া যায়নি। দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় মোঙ্গলরা বৈকাল হ্রদের পূর্বদিকে, মঙ্গোলিয়ার প্রান্তদেশ, সাইবেরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ার নানা জায়গায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বাস করত। ১১৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত মোঙ্গল-বীর তামুজিন এই খণ্ড জাতিগুলির মিলন ঘটিয়ে পরাক্রান্ত মোঙ্গল

শক্তির ভিত্তি রচনা করেছিলেন। মোঙ্গলিয়া-সংলগ্ন পশ্চিমাঞ্চলে এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চেঙ্গিস খাঁ। ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ পরলোকগমন করেন। ১২৭১ খ্রীস্টাব্দে কুবলাই মোঙ্গলজাতির 'খান-ই-খানান' (সর্বাধিনায়ক) নির্বাচিত হন। ইউয়ান বংশের কুবলাই-এর চীনা-নাম ছিল 'সি সু'। কুবলাই-এর শাসনকালকে মোঙ্গল শাসনের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হলেও মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর নামমাত্র আধিপত্য ছিল। চম্পা (বর্তমান কম্বোডিয়া) মোঙ্গলদের আধিপত্য স্বীকার করলেও জাপানের বিরুদ্ধে কুবলাই সাফল্য লাভে ব্যর্থ হন। ব্রহ্মদেশে কুবলাই-এর অভিযান অপেক্ষাকৃত সাফল্যমণ্ডিত হয়। শ্যামদেশ কুবলাইকে কর প্রদান করত। বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কুবলাই-এর দূত জলপথে দক্ষিণ-ভারত এমনকি আফ্রিকার মাদাগাসকারে উপনীত হন। বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কুবলাই-এর সাম্রাজ্যের সীমা অনেকটা প্রসারিত হয়েছিল। কুবলাই-এর শাসনকালে দক্ষিণ-পশ্চিমের ইউনান প্রদেশটি চিরকালের মত চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দে আশি বছর বয়সে কুবলাই-এর মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধরেরা ছিল দুর্বল ও স্বল্পায়ু। চীনে মোঙ্গল সাম্রাজ্য আরও ৭৪ বছর কোনক্রমে টিকে ছিল। কুবলাই খাঁর রাজত্বকাল মোঙ্গলদের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট যুগ। এতদিন পর্যন্ত মোঙ্গলরা একটি দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিরূপে খ্যাত ছিল। তাদের যুদ্ধ ছিল সব কিছু ধ্বংস করার যুদ্ধ। কোন গ্রাম, শহর বা সভ্যতা তাদের হাতে রেহাই পেত না। মোঙ্গলরা এসব সম্পূর্ণভাবেই ধ্বংস করত। যে সব সভ্যতা তারা ধ্বংস করত তাদের থেকে তারা কোন শিক্ষালাভ করত না।



কুবলাই খাঁ

কুবলাই খাঁ কিন্তু নতুন ধরনের মোঙ্গল শাসক ছিলেন। তিনি ইউয়ান বংশের শাসকরূপে খাঁটি চীনা শাসকে পরিণত হলেন। তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না, বরং প্রজাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি শিক্ষার উন্নতি করেছিলেন এবং শিল্পকলার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের সুবিধার জন্য

রাস্তাঘাট তৈরীর ব্যবস্থা করেছিলেন। চীনদেশের সঙ্গে দূর-দূরান্তের সংযোগ-সাধনকারী রাস্তাগুলি তিনি সংস্কার করেছিলেন। মোঙ্গলদের কঠোরতা ও সমরস্পৃহা সভ্য চীনা সংস্কৃতির সংস্পর্শে দূর হয়ে গিয়েছিল। মোঙ্গলদের যুদ্ধ করবার ইচ্ছা এত তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল যে চীনের সিং বংশীয় শাসকরা চীন থেকে তাদের একসময় সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত করেছিলেন।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সময়ে (১৩৬৯ খ্রীঃ) তুর্কী মুসলমানরা তৈমুরলঙ্গের নেতৃত্বে ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিলেন এবং এই অঞ্চল থেকে পারস্য ও নিকটতর এশিয়ার অঞ্চলগুলি জয় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তৈমুরের নেতৃত্বে ইসলাম তার সামরিক সাগঠন শক্তিশালী করেছিল। পারস্যের শাসকরা এই সময় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং চীনদেশ ও ইউরোপের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। তার আগে এই রাস্তা দীর্ঘ হলেও নিরাপদ ছিল। পৌত্তলিক অথচ সহিষ্ণু মোঙ্গলদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্যই এই রাস্তা খোলা হয়েছিল। ১২৫৪ খ্রীস্টাব্দে কারপিনির ফ্রায়ার জন, পোপ চতুর্থ ইন্নোসেন্টের প্রতিনিধিরূপে কারাকোরামে পৌঁছেছিলেন ; ১২৫৫ খ্রীস্টাব্দে রুঁ ব্রাকের ফ্রায়ার, সেণ্ট লুই-এর প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন। ধর্মপ্রচারক-রূপে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন যদিও পরবর্তীকালের কিছু ধর্মপ্রচারক চীন ও পারস্যের কিছু লোককে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু চীন সম্পর্কে তাঁদের বিবৃতি ইউরোপে প্রকাশিত হলে সেখানকার বহুসংখ্যক বণিকরা বাণিজ্যের জন্য চীনদেশে আসতে থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মার্কো পোলোর বিবরণঃ মার্কো পোলো ছিলেন একজন ভেনিসীয় বণিক। কুবলাই খাঁর অধীনে তিনি চীনদেশে আঠারো বছরকাল (১২৭৪-৯২ খ্রীঃ) কর্মরত ছিলেন এবং ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দে সমুদ্রপথে চীনদেশ থেকে পারস্য উপসাগর হয়ে ভেনিসে ফিরেছিলেন। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জেনোয়ার একটি কারাগারে সঙ্কলিত হয়েছিল। মোঙ্গলদের অধীনে চীনদেশ তথা এশিয়া সম্বন্ধে এই বিবরণ অত্যন্ত নিখুঁত। ইউয়ান বংশের পতন এবং তৈমুরলঙ্গের যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সুদূর প্রাচ্য আবার অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। ইউয়ান বংশীয়দের শাসনকালে সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। কুবলাই-এর শাসন ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের

অর্থনৈতিক অবস্থার কথা মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে জানা যায়। মার্কো পোলো চীনদেশে এসেছিলেন সুদূর ইতালি থেকে। চীনা সভ্যতার বৈশিষ্ট্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, কুবলাই খাঁর শাসনকালে চীন সাম্রাজ্যের আয়তন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়ে পাঁচ কোটি নয় লক্ষে দাঁড়িয়েছিল। কুবলাই পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি বিদেশীদের প্রতি সহানুভূতিশীলও ছিলেন। রাজকার্যে তিনি বিদেশীদের নিয়োগ করেছিলেন। চাকরির জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে বিদেশীদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না হয়। কুবলাই তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। কুবলাই-এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আহ্‌মদ নামে এক কুচক্রী বিদেশী মুসলমান। কুবলাই এক হাজার মাইল দীর্ঘ একটা মজে যাওয়া খালের সংস্কার করেছিলেন, ডাক চলাচলের জন্য কয়েকটা রাজপথও তৈরী করেছিলেন। তিনি কারাকোরামের মরু অঞ্চল থেকে সরিয়ে বর্তমান পিকিং শহরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মোঙ্গল সেনাবাহিনীতে বিদেশীরা নিযুক্ত হত। জল ও স্থল—উভয় পথেই বাণিজ্য চলত। স্থলপথ ছিল সিনকিয়াং বা চীন-তুর্কীস্তানের মধ্য দিয়ে। বাণিজ্য-পথের ধারে ধারে শহর ও বন্দরগুলি সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই শহরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল ফুকিয়েন প্রদেশে অবস্থিত চুয়ান-চৌ।



মার্কো পোলো

(খ) জাপান

নবম পরিচ্ছেদ

জাপানে মধ্যযুগের প্রারম্ভে সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি: প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে পূর্বদিকে জাপানের অবস্থান। এজন্য জাপানকে বলা হয় 'দাই-নিপ্পন' বা 'উদিত সূর্যের দেশ'। জাপান সাম্রাজ্য হন্‌সু, কিউসিউ,

সিকোকু, হোক্কাইডো, সাখালিন এবং লুচু দ্বীপগুলি নিয়ে গঠিত। জাপানের অধিকাংশ ভূমিই পর্বতসঙ্কুল এবং মালভূমি অঞ্চল। অতি সামান্য পরিমাণ উর্বর জমিতে জাপানীরা কঠোর পরিশ্রম করে ধানচাষ করে। ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে শগুন ওরিতোমোর মৃত্যু হল চার বছর গৃহযুদ্ধ চলার পর তাঁর স্ত্রীর বংশের হোজোরা জাপানের শাসনক্ষমতা অধিকার করল। এর পর জাপানে প্রায় আট শতাব্দীকাল একাদিক্রমে সামরিক অভিজাতরা সামন্ততান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করেছিলেন। প্রাচীন জাপানে সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন তাকুগাওয়া ক্ষমতায় এসেছিলেন তখনকার সামাজিক অবস্থা এরূপ ছিল: সামাজিক মর্যাদায় সবচেয়ে বড় ছিলেন সম্রাটের পরিবার, সম্রাটের প্রত্যক্ষ জমিদাররা এবং দরবারের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় 'কুজি'রা। সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন 'শগুন' উপাধিধারী ব্যক্তি। সম্রাটের রাজনৈতিক ক্ষমতা শগুনরা অপহরণ করেছিল। শগুনরাই সম্রাটকে জমি দিত এবং বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ করত। সম্রাটের দরবারের অভিজাতরা দরিদ্রতম সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতের চেয়েও কম অর্থে নিজেদের ভরণপোষণ চালাতেন। মর্যাদার দিক্ থেকে সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল উচ্চ সামরিক ব্যক্তিরা যারা 'সামুরাই' আখ্যা পেয়েছিল। সামুরাইরা জাপানের সামন্ততান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি রচনা করেছিল। জাপানের সামরিক সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শগুন থেকে আরম্ভ করে সাধারণ পদাতিক সৈন্য পর্যন্ত বহু পর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন :—(১) 'দাইমিও' বা বড় জমিদাররা, যাঁরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় দু'শ সত্তর জন। এঁদের প্রত্যেকে জমিতে দশ হাজার 'কুকু'র চাইতেও বেশী চাল পেতেন ; (২) হাতামত' নামে শগুনদের অনুচরগণ ; (৩) 'হাতামত'দের অনুচর 'বাইসিন'গণ ; (৪) 'রনিন' বা সাধারণ সৈন্যগণ ; (৫) 'ঘোসি' অথবা কৃষক-যোদ্ধা, যারা কেবল যুদ্ধের সময় সৈন্যরূপে কাজ করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি ; এর মধ্যে 'দাইমিও' ও তাদের অনুচরদের সংখ্যা ছিল কুড়ি লক্ষ এবং ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে 'রনিন'দেয় সংখ্যা ছিল প্রায় চার লক্ষ।

দশম পরিচ্ছেদ

জাপানী সম্রাটের সর্বাধিনায়কত্ব ঃ চীনের সঙ্গে জাপানের নিবিড় সম্পর্ক ঃ জাপানের শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিলেন মিকাডো (সম্রাট)। আইনতঃ সম্রাটই ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান পুরোহিত। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী থেকে তিনি শাসন না করে নামেমাত্র রাজত্ব করেছিলেন। সম্রাট লোকচক্ষুর অগোচরে এবং সম্পূর্ণ গোপনে কিয়োতো শহরে রাজকীয় অভিজাতগণ (কুজি) কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করতেন। জাপানে একই বংশের সম্রাটগণ অতি প্রাচীনকাল থেকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী শাসন করছিলেন। প্রায়ই তাঁরা একাধিক পত্নী ও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে সিংহাসনে তাঁদের মনোনীত উত্তরাধিকারী বসাতেন।

সুদূর প্রাচ্যের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে জাপানের সঙ্গে এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। একটা অপরিসর প্রণালী জাপানকে কোরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কোরিয়ার অবস্থান জাপানের বুকে যেন প্রসারিত ছুরিকার মত। সম্ভবতঃ সাখালিন দিয়ে কোরিয়ার অধিবাসীরা জাপানে এসেছিল এবং এদের সঙ্গে দক্ষিণের অন্যান্য জাতির মিশ্রণের ফলে বর্তমান জাপানের জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে। প্রাচীন-কোরিয়ার কৃষ্টির অনেকাংশই জাপানে এবং চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছিল। জাপানের ধর্মীয় ভাবধারা, কলা, সাহিত্য এবং শিল্প কোরিয়ার সান্নিধ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। যখন মোঙ্গলরা কোরিয়া ও চীনে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল তখন জাপানের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। অতি প্রাচীনকালেই জাপান কোরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে নিজ সার্বভৌমত্ব বিস্তার করেছিল।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কোরিয়ায় জাপানের সর্বাধিক প্রভাব দেখা দিয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাপক সংখ্যায় বহিরাগত এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে জাপানে প্রবেশ করতে থাকে। এই বহিরাগতরা তাদের সঙ্গে মৌলিক চীনদেশীয় ভাবধারা এবং রীতিনীতি আনতে থাকে। তারা চীনদেশ থেকে উন্নত ধানচাষ ও জলসেচ পদ্ধতিও জাপানে এনেছিল। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ওয়ানী নামে জনৈক কোরীয় পণ্ডিত জাপানী অভিজাতদের মধ্যে কনফুসিয়াসের রচনাবলী প্রচারের মাধ্যমে চীনদেশীয় শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এইভাবে চীনদেশের সংস্কৃতি জাপানে প্রসারলাভ করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবর্তিত হয়ে অনতিবিলম্বে কিছু জাপানীকে এই ধর্মে দীক্ষিত করে। এদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কিছু

জাপানী চীনদেশে ছাত্র হিসাবে এসে চীনদেশীয় সভ্যতার সফল দূতরূপে জাপানে প্রত্যাবর্তন করে। শেষ পর্যন্ত জাপানের রাজসভা চীনা ও বৌদ্ধদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই অবস্থায় জাপানী সভ্যতার জনক শতুকো তাইসী জাপানে বিপ্লবাত্মক সংস্কার পরিকল্পনা প্রবর্তন করলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৃহৎ পরিবারদের প্রতিরোধঃ শিন্টোধর্মের সর্বোচ্চ পুরোহিত ও শাসকরূপে সম্রাটের ক্ষমতা গ্রহণঃ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার নৌ-বাহিনীর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী কমোডোর প্যারী জাহাজে চেপে জাপানের উপকূলে পৌঁছান। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্যারীর সঙ্গে শগুনের প্রতিনিধিরা 'কানাগাওয়ার সন্ধি' স্বাক্ষর করেন। জাপানীরা আমেরিকানদের আগমনে আদৌ আশ্চর্যান্বিত হয় নি, কারণ এর আগে ওলন্দাজরাও জাপানে এসেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দেখাদেখি ইংরেজ ও রাশিয়ানরাও জাপানে আসে এবং আমেরিকানদের মত তারাও জাপানের সঙ্গে সন্ধি স্বাক্ষর করে।

বিদেশীদের জাপানে আসার সময় থেকে অভ্যন্তরীণ কলহে শগুনের প্রতিপত্তি বিশেষ হ্রাস পায়। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের আগে থেকেই 'তোজামা' বা পশ্চিমী জমিদাররা (সাৎসুমা, চৌসু, হিজেন ও তোসা) তাকুগাওয়াদের শত্রু ছিলেন। এই সময় তাকুগাওয়াবংশীয় শগুনরা জাপান শাসন করছিল। পশ্চিমী জমিদাররা বিশ্বাস করতেন যে জাপানে বিদেশী শক্তিবর্গের আগমনের জন্য তাকুগাওয়াবংশীয় শগুনরাই প্রধানতঃ দায়ী। শগুন তাঁর দুর্বলতা উপলব্ধি করে বিদেশীদের জাপানে আগমনের প্রশ্নে সম্রাটের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। পশ্চিমী জমিদাররা অবশ্যই বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন ; তা সত্ত্বেও জাপানের মঙ্গলের চেয়ে শগুনকে দুর্বল করার আগ্রহই ছিল তাঁদের খুব বেশী। জাপানের যোদ্ধাদের বা সামুরাইদের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোর জন্য শগুন শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেন। এর ফাল চীনদেশীয় প্রভাবে গঠিত জাপানী সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়। প্রাচীন শিন্টোধর্ম পুনঃপ্রবর্তিত হল। ফলে জাপানের জনগণ অবগত হল যে সম্রাটই তাদের ধর্মীয় প্রধান ; সম্রাটের সম্মান অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পেল। শিন্টোধর্মের পুনরুজ্জীবনের ফলে ইতিহাসচর্চা জাপানে আরম্ভ হল। ইতিহাসপাঠের ফলে জাপানের মানুষ জানল যে পূর্বে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্রাট ভোগ করতেন শগুন তা অপহরণ করেছেন। স্বভাবতই জাপানের জনমত শগুনের বিরুদ্ধে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জাপানে কেন্দ্রীয় শক্তির ক্রমিক দুর্বলতা ঃ জাপানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। দেশ গভীর সঙ্কটের মুখে পড়ল। চৌসু বংশ সম্রাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল যাতে তাকুগাওয়া শগুনদের পরিবর্তে নতুন একটি বংশের শগুনরা জাপান শাসন করতে পারে। কিন্তু চৌসু বংশের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। কিয়োতো থেকে সম্রাট আদেশ দিলেন যে চৌসুর এই ষড়যন্ত্রের জন্য শগুন যেন তাঁর শাস্তিবিধান করেন। এর ফলে শগুন অনেক সৈন্য সংগ্রহ করে চৌসুর বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান। কিন্তু এতে শগুন পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন নি। চৌসু ও অন্য তিনটি দলের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শগুনের পতন ঘটানোর জন্য মিলনের চেষ্টা করেন এবং পশ্চিমের চারিটি বংশের নেতৃবর্গ ঐক্যবদ্ধ হন। এই ঘটনার কিছুকাল পর বিদেশী শক্তিবর্গের বিরোধী শাসক সম্রাটের মৃত্যু হয়। নতুন সম্রাট মুৎসোহিতো ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে 'মেইজী' উপ্যাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পশ্চিমের শক্তিশালী চারটি বংশ এক এক স্মারকপত্রে শগুনকে পদত্যাগ করবার অনুরোধ জানান। শগুন পদত্যাগ করে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেন।

দুর্ধর্ষ সামুরাইদের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোর জন্য শগুন জাপানের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের চর্চাও জাপানে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়েছিল। পণ্ডিতরা স্বভাবতই প্রশ্ন করতে থাকেন— সম্রাট কেন লোকচক্ষুর অগোচরে কিয়োতোয় বসবাস করেন এবং শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আসনে শগুনকে রাখা হবে কেন? জাপানের প্রাচীন ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্মের চর্চাও শগুনের পতনে সহায়ক ছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শগুনতন্ত্র ও সামুরাইগণ ঃ পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সম্প্রদায় শগুনরূপে জাপান শাসন করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হিদেযোশী যুদ্ধ না করেও শগুনরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জাপানী সামরিক ইতিহাসে হিদেযোশী একটি বিখ্যাত নাম। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কোরিয়া এবং চীন সাম্রাজ্য অধিকার করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর তাঁর জনৈক সমর্থক ইয়েয়াসু ক্ষমতায় আসীন হলেন। দীর্ঘকালব্যাপী তাকুগাওয়া বংশের মধ্যে তিনিই প্রথম শগুনরূপে জাপান শাসন করতে থাকেন।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট প্রকৃত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না-হওয়া পর্যন্ত তাকুগাওয়া বংশই শগুনরূপে কাজ চালাতে থাকে। দীর্ঘ ২৫০ বছরের উপর এই বংশের শগুনরাই দেশ শাসন করেছিলেন।

জাপানের জনসংখ্যার ছ শতাংশ ছিল সামুরাই বা যোদ্ধাগণ। তাকুগাওয়া যুগের প্রারম্ভে এদের অধিকাংশ ছিল অশিক্ষিত, কিন্তু এই যুগের শেষভাগে সামুরাইগণ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। জাপানের সামরিক সম্প্রদায়রূপে খ্যাতির অধিকারী সামুরাইদের মধ্যে অনেক বিভাগ ছিল। তাঁদের বংশানুক্রমিক আয় দ্বারা তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং জাপানের রাজনৈতিক কৃষ্টির জীবনও তাঁরা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদার জন্য তাঁরা বিশেষ গর্বিত ও উদ্ধত হয়ে ওঠেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে জাপানের নূতন সরকার চারটি সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধার বিলোপ সাধন করেন এবং সম্রাটের সমস্ত প্রজাকে আইনের দৃষ্টিতে সমানরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বুসিদো : খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে জাপানে সামুরাইগণ যে নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করতেন তাদের সবগুলি একত্রে মিলিয়ে 'বুসিদো' বলা হত। জাপানের যোদ্ধারা বুসিদোর আদর্শগুলি পালন করত। জাপানের বুসিদো ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় শিভালরির আদর্শের মত। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে বুসিদো ছিল সৈনিকদের জন্য কর্তব্য পালনের আইনকানুন। যেহেতু ওরিতোমোর সময় থেকেই জাপান সাম্রাজ্য সৈন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল সেজন্য সৈনিকদের কর্তব্য পালন সম্বন্ধে একটা অনুশাসন রচনার প্রয়োজন ও সুযোগ দেখা দিল। বুসিদোর আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল সামরিক দক্ষতা, ক্রীড়া-নৈপুণ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীকতা, ব্যক্তিগত জীবনে মিতব্যয়িতা, দয়া, শুদ্ধচিত্ততা ইত্যাদি। বুসিদোর আদর্শ ছিল একজন প্রভুর প্রতি অনুগত থেকে তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত সেবা করা। বুসিদো চরম বিকাশ লাভ করে তাকুগাওয়া যুগে। এই সময় নিম্ন শ্রেণীর জনগণের প্রতি দয়ামায়া দেখাতে ইমাগাসেকো জাপানের মানুষের কাছে আবেদন জানান। এই কারণে কনফুসিয়াসের প্রবর্তিত গুণাবলী ও দয়া বুসিদোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে আইনগতভাবে সামুরাই শ্রেণীর বিলুপ্তির পর বুসিদোর আদর্শ জাপানী জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জাপানের জাতীয়তাবাদ বিকাশে

এবং ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা পতনের ফলে এক ভয়াবহ ধ্বংসের অবস্থার মধ্যে জাপানী জনগণের মনবল গঠনে বুসিদো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জাপানের সম্রাট সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করলে বুসিদো নীতি-শিক্ষার প্রধান উপাদান হয়ে উঠল।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। তাঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
২। তাঙ যুগের দু'জন বিখ্যাত গল্প-লেখকের নাম কর।
৩। কোন্ সময় থেকে চীনে চা-পানের অভ্যাস আরম্ভ হয়েছিল ?
৪। তাঙ যুগে চীনের রাজধানী কোথায় ছিল ?
৫। সপ্তম শতাব্দীতে চীনের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কি ছিল ?
৬। হিউয়েন-সাং কে ?
৭। কমোডোর প্যারী কে ?
৮। মোঙ্গল আমলের 'স্বর্ণযুগ' কি ছিল ?
৯। 'শগুন' কে ছিলেন ?
১০। 'দাইমিও' কারা ছিলেন ?
১১। কুবলাই খাঁ কে ছিলেন ?
১২। মার্কো পোলো কে ছিলেন ?
১৩। কত খ্রীস্টাব্দে হিউয়েন-সাং ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে চীন ত্যাগ করেছিলেন ?
১৪। হিউয়েন-সাং ছাড়া ভারতে আগমনকারী অন্যান্য চীনা পরিব্রাজকের নাম উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। তাই-সুং-এর বিচারবিষয়ক সংস্কারগুলি আলোচনা কর।
২। তাই-সুং-এর রাজ্যবিজয় সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩। তাঙ যুগের চিত্রশিল্পের বর্ণনা দাও।
৪। তাঙ যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য বর্ণনা কর।
৫। প্রথম তাঙ সম্রাটের কৃষি সংস্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৬। চীনের সঙ্গে জাপানের কিভাবে নিবিড় সম্পর্ক ছিল আলোচনা কর।
৭। জাপানের সম্রাট মিকাডোর মর্যাদা আলোচনা কর।
৮। সামুরাইদের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৯। তাঙ যুগকে 'কবিতার স্বর্ণযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে কেন ?
১০। হিউয়েন-সাং-এর ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে যা জান লেখ।
১১। পশ্চিমের চারটি বংশের নেতৃবর্গ কর্তৃক শগুনকে প্রতিরোধের বিবরণ দাও।
১২। কুবলাই খাঁর রাজ্যজয়ের বিবরণ দাও।
১৩। মার্কো পোলের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১৪। জাপানের শিভালরি (বুসিদো) সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৫। সুং যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১৬। কমোডোর প্যারীর জাপানে আবির্ভাবের প্রাক্কালে এই দেশের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।
১৭। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুং যুগের সংস্কারগুলি আলোচনা কর।
১৮। জাপানের সামুরাই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। চীনের তাঙ শাসকদের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
২। হিউয়েন-সাং-এর চীনে ফিরে যাবার পর সেখানকার মানুষের মনে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল ?
৩। কুবলাই খাঁ-এর শাসনকালকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয় কেন ?
৪। হিউয়ান রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। তাঙ বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?
২। কুবলাই খাঁর চীনা নাম কি ছিল ?
৩। তাঙ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর কে ছিলেন ?
৪। কোন্ দেশকে উদিত সূর্যের দেশ বলা হয় ?

———

গুপ্তদের পতন, হর্ষের যুগ, বাংলার ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুপ্তোত্তর যুগ (খ্রীস্টীয় ৫ম—৭ম শতাব্দী) : মগধকে কেন্দ্র করে গুপ্তযুগে ভারতে যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তা বিলুপ্ত হল। ভারত বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হল। ভারতবর্ষ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গান্ধার থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ভূভাগে একটি শক্তিশালী হূণ রাজ্য স্থাপিত হল। হূণ রাজ্যের দক্ষিণে ছিল মৈত্রক বংশের বলভী রাজ্য। রাজপুতানায় হূণ জাতির গুর্জর শাখা একটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। উত্তর ভারতের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ছিল দিল্লীর নিকট পুষ্যভূতি বংশের থানেশ্বর। মৌখরি বংশের কনৌজ, পরবর্তী গুপ্তবংশীয়দের মগধ ও পূর্ব-মালব রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের যথাক্রমে বঙ্গ ও গৌড় রাজ্য দুইটি এবং নেপাল, কামরূপ ও উড়িষ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল। পশ্চিম মালবের মান্দাসোরে যশোধর্মন আর একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হূণদের আক্রমণ ও ভারতে রাজ্য স্থাপন : স্কন্দগুপ্তের সিংহাসন আরোহণের পর তাঁকে হূণ আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হূণরা ছিল মোঙ্গল জাতির একটি শাখা। তারা বর্বর, নির্মম ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধারূপে খ্যাত ছিল। মধ্য-এশিয়ায় এরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে বাস করত। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে হূণরা পঙ্গপালের মত ইউরোপের উপর আক্রমণ চালায় এবং রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করতে থাকে। প্রায় একই সময় হূণ জাতির আর একটি শাখা পারস্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করে। এরা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত। হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে এই হূণরা গান্ধার অধিকার করে এবং জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। এরপর

গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে স্কন্দগুপ্তের হাতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কিছুকাল পর তারা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে এবং পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম ভারত, পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার একাংশে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে। বাল্‌খ্‌ ছিল এই সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে হূণ-নায়ক তোরমান পাঞ্জাব থেকে সসৈন্যে আক্রমণ চালিয়ে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলা পর্যন্ত জয় করে এক শক্তিশালী রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁর শাসনকালের মুদ্রা থেকে জানা যায় যে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা এবং কাশ্মীরের কিছু অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তোরমান হূণ ছিলেন কি না এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি একজন কুষাণ সামন্ত ছিলেন।

তোরমানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিহিরকুল বা মিহিরগুল হূণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন (আঃ ৫১৫ খ্রীঃ)। মিহিরকুল বিশেষ শক্তিশালী হলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসক ছিলেন। মিহিরকুলের রাজধানী ছিল শাকল বা শিয়াল-কোট। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং মিহিরকুলের রাজত্বকাল এবং তাঁর নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে বিবরণ রেখে গেছেন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে মগধের গুপ্ত সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য এক-বার যুদ্ধে মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত, অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী বালাদিত্য দয়াপরবশ হয়ে মিহিরকুলকে মুক্তি দান করেছিলেন। মিহিরকুল স্বরাজ্যে ফিরে দেখলেন যে তাঁর ভাই সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছেন। তখন নিরুপায় হয়ে মিহিরকুল কাশ্মীর রাজ্যে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে মিহিরকুল কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করে নিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পর মিহিরকুলের মৃত্যু হয়। মিহিরকুলের অত্যাচারে ভারতের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে মালবের অন্তর্গত দশপুরের (মান্দাসোর) রাজা যশোধর্মন তাঁকে পরাজিত করে হূণশক্তি ধ্বংস করেন। যশোধর্মনের মৃত্যুর পর মিহিরকুল পুনরায় শক্তি-শালী হয়ে উঠলে বালাদিত্য তাঁকে পরাজিত করে হূণ শক্তি ধ্বংস করেন। মিহিরকুলের পরাজয়ের সঙ্গে যশোধর্মন ও নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের নাম জড়িত আছে। এঁরা একযোগে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মিহিরকুলকে পরাজিত করেছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে কিছু বলা দুরূহ। মিহিরকুল সম্ভবতঃ প্রথমে যশোধর্মনের কাছে পরাজয় বরণ করেন। মিহিরকুলের পরাজয়ের পর হূণ

শক্তির যে পতন আরম্ভ হয়েছিল তা আর রোধ করা যায় নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব হূণ বসবাস করছিল তারা কালক্রমে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঃ হর্ষবর্ধনের যুগ ঃ সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণদের আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত করেছিলেন সত্য কিন্তু হূণদের ক্রমাগত আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়েছিল। বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর পাঞ্জাব ও মালবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হূণরা অধিকার করে। বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তখন যশোধর্মন নামে এক ব্যক্তি মালবে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। দশপুর বা মান্দাসোর ছিল তাঁর রাজধানী। যশোধর্মনের পিতৃবংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি গুপ্ত রাজবংশের অধীন মালবের কোন সামন্ত বংশসম্ভূত ছিলেন। যশোধর্মনের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে গঞ্জাম এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিহিরকুলকে পরাজিত করে তিনি হূণ ভীতি থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। গুপ্ত সম্রাটরা তখন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করলেও যশোধর্মন যে উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

যশোধর্মনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গেল। কালক্রমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। এবং উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কনৌজের মৌখরি বংশ নিজ শক্তি বিস্তার করতে থাকে। কনৌজের মৌখরি নরপতিরাও বিদেশী হূণদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশানবর্মন নামে এক শক্তিশালী নরপতি মৌখরি বংশের শাসক ছিলেন। তিনি অন্ধ্র, উড়িষ্যা এবং গৌড় জয় করে মৌখরি রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। মৌখরিদের এই অভ্যুত্থানের ফলে মগধের উত্তরকালীন গুপ্ত বংশের রাজাদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ দেখা দিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মগধে উত্তরকালীন গুপ্ত রাজারা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের উপর আধিপত্য নিয়ে এঁদের সঙ্গে মৌখরি বংশের যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়। ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত মৌখরি রাজারা উত্তরপ্রদেশে নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

এই সময় কনৌজ মৌখরি রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রমাণ পাওয়া যায় মৌখরিরাজ ঈশানবর্মন হূণদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে এই বংশের গ্রহবর্মন কনৌজে রাজত্ব করতেন। গ্রহবর্মন বিবাহ করেছিলেন থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশীয় রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে। কিন্তু মালবরাজ দেবগুপ্ত এবং গৌড়ের নরপতি শশাঙ্কের সম্মিলিত আক্রমণে গ্রহবর্মন পরাজিত ও নিহত হন।

গ্রহবর্মনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মৌখরি বংশ বিলুপ্ত হয়। থানেশ্বর রাজ্যটি কবে স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায় না। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি পরে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই রাজ্যের রাজা প্রভাকরবর্ধন রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন এবং হূণ, গুর্জর ও মালবদের একে একে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ তাঁর রাজ্য পাঞ্জাব থেকে মালব ও গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন উত্তর পাঞ্জাবে হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। পিতার গুরুতর রোগের সংবাদ পেয়ে তিনি হূণদের সঙ্গে যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে রাজধানীতে ফিরে এলেন। থানেশ্বরে পৌঁছবার আগেই প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয়েছিল। রাজ্যবর্ধন সিংহাসন লাভ করেই জানতে পারলেন যে মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্কের সম্মিলিত আক্রমণের ফলে তাঁর ভগ্নীপতি কনৌজরাজ গ্রহবর্মন নিহত এবং রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হয়েছেন। এই সংবাদ পেয়ে থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন, কিন্তু দেবগুপ্তের মিত্র গৌড়রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন নিহত হন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হর্ষবর্ধন কনৌজের রাজপদেও অভিষিক্ত হন, কারণ গ্রহবর্মনের পত্নী রাজ্যশ্রী তখন কারারুদ্ধ। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে বিন্ধ্য পর্বতের গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধন যখন ভগ্নীর সন্ধান পেলেন তখন রাজ্যশ্রী অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতির উদ্যোগ করছিলেন। হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে থানেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন। কনৌজ রাজ্যও হর্ষবর্ধনের শাসনাধীনে আসে। হর্ষবর্ধনের শাসনাধীনে কনৌজ ও থানেশ্বর রাজ্য দুটি একত্র হওয়ার জন্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। হর্ষবর্ধন এই সম্মিলিত রাজ্যের রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। প্রথমে হর্ষবর্ধন 'রাজপুত্র' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ; ৬১২ খ্রীস্টাব্দে

তিনি "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ৬০৬-৬১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হর্ষবর্ধন ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর প্রধান শত্রু ছিলেন গৌড়রাজ শশাঙ্ক। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যলাভ করার উদ্দেশ্যে হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হয়েছিলেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের অভিযানের ফলাফল জানা যায় না। ৬১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক যে পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনুমান করা যায় যে হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছিল। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে শশাঙ্ক তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৬৩৮ খ্রীঃ) মগধের উপর আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শক্তিশালী ভাস্করবর্মনের সাহায্য নিয়েও হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করতে ব্যর্থ হন। এর দ্বারা গৌড়রাজ শশাঙ্কের অসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।



হর্ষবর্ধন

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, সম্ভবতঃ ৬৪১ খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধন নিজেকে 'মগধাধিপ' বলে ঘোষণা করেন। এই সময় থেকে হর্ষবর্ধন মগধের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং উত্তরবঙ্গ জয় করেন। তাঁর মিত্র ভাস্করবর্মন পরবর্তীকালে বাংলার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধন কঙ্গোদ রাজ্য (বর্তমান উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা) অধিকার করেন। পশ্চিম ভারতের বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। হর্ষবর্ধন বলভী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি। গুর্জর রাজ্যের বলভী রাজ্য তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়। হিউয়েন সাং-এর বিবরণে আছে যে হর্ষবর্ধন বলভীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে নিজ কন্যার সঙ্গে বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুব সেনের বিবাহ দেন। সম্ভবতঃ তিনি সিন্ধু এবং কাশ্মীরেও অভিযান করেছিলেন। ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে হর্ষবর্ধন নর্মদা নদী অতিক্রম করে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু চালুক্য-রাজের কাছে তিনি পরাজিত হন। তাঁর পক্ষে নর্মদা নদীর

দক্ষিণে বাজ্য বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করে তিনি 'সকলোত্তরপথনাথ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

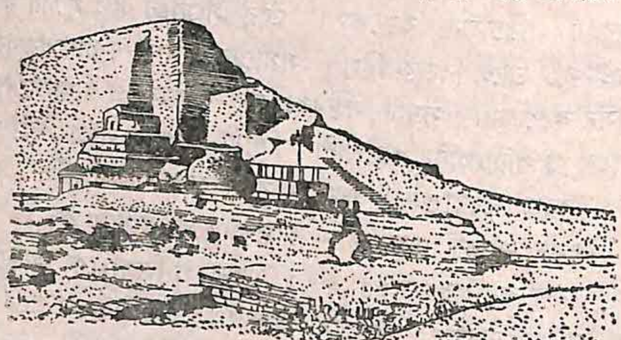
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিউয়েন-সাং এর ভ্রমণ বিবরণ ঃ বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে চীনদেশ থেকে যাত্রারম্ভ করে গান্ধারে উপনীত হন। ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে হিউয়েন-সাং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হিউয়েন-সাং ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশ পরিদর্শন করে এই দেশের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনকে অক্লান্ত পরিশ্রমী শাসকরূপে উল্লেখ করেছিলেন।

হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা নিজেই দেখাশুনা করতেন। গুপ্তযুগের তুলনায় হর্ষবর্ধনের সময় দণ্ডবিধি কঠোরতর হলেও দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। হিউয়েন-সাং স্বয়ং একাধিকবার দস্যুর কবলে পড়েছিলেন। রাজকর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করতেন। হর্ষবর্ধন অতি উদার ও ধর্মপ্রাণ রাজা ছিলেন। জনগণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর সাম্রাজ্য গুপ্ত যুগের মত 'ভুক্তি' ও 'বিষয়' এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সম্রাটের মনোনীত রাজপুরুষরা প্রদেশ ও ভুক্তি শাসন করতেন। সম্রাট সম্ভবতঃ মন্ত্রি-পরিষদ ও অমাত্যদের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে রাজপুরুষদের কাজ দেখাশুনা এবং শাসনসংক্রান্ত বিষয়গুলি তত্ত্বাবধান করতেন। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে আদায় হত। প্রজাদের কাছ থেকে অনেক কম কর নেওয়া হত। বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে বেগার খাটান হত না। সাধারণ অপরাধে কারাদণ্ড ও নির্বাসন এবং গুরুতর অপরাধের জন্য অঙ্গচ্ছেদ করা হত। অপরাধীর অপরাধ কবুল করাবার জন্য জল, আগুন এবং বাটখারা প্রভৃতি দ্বারা দৈব পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

হর্ষবর্ধনের শাসনকালে প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্য বহু ব্যবস্থা ছিল। অসুস্থ লোকদের চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বহুস্থানে হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা বিনামূল্যে রোগীদের পরীক্ষা ও ওষুধের ব্যবস্থা কয়তেন। রাজ্যের সর্বত্র অতিথিশালা ও খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর রাজত্বকালে কনৌজ উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ

নগরে পরিণত হয়েছিল। কনৌজে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সম্মেলনের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ হিউয়েন-সাং লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরোভাগে হাতীর পিঠে বুদ্ধমূর্তিসহ হর্ষবধন এক শোভাযাত্রায় হিউয়েন-সাং এবং ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই ধর্ম-সম্মেলনে উপস্থিত হতেন। শোভাযাত্রা শেষ হবার পর বুদ্ধমূর্তির পূজা হত। পূজার পর গণভোজ হত। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গঙ্গা ও যমুনা নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থল প্রয়াগে হর্ষবর্ধন পঁচাত্তর দিন ধরে এক ধর্মোৎসবের আয়োজন করতেন। যে খোলা জায়গায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত তার নাম ছিল 'দানক্ষেত্র' বা 'সন্তোষক্ষেত্র'। হর্ষবধনের আমন্ত্রণক্রমে হিউয়েন-সাং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক দানোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। হর্ষবর্ধন স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজকীয় ভূসম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তিনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহীদের জন্য ব্যয় করতেন। এই যুগের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দা হর্ষবর্ধনের অর্থসাহায্য লাভ করত। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভারতে তখন শিক্ষার বিশেষ সমাদর ছিল। দেশে বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল এবং অসংখ্য ছাত্র সেই সব স্থানে অধ্যয়ন করত। পাটলিপুত্রের কাছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন এশিয়ার বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্যার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য এখানে আসতেন।



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

এখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র লেখা-পড়া করত। হিউয়েন-সাং দু বছর এখানে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। অভিজ্ঞ অধ্যাপকরা ছাত্রদের ধর্ম, দর্শন, ন্যায়, গণিত, আয়ুর্বেদ, রসায়ন, জ্যোতিষ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। যে কেউ ইচ্ছা করলেই পড়াশোনার জন্য এখানে প্রবেশ করতে পারত না। শিক্ষার্থী কঠিন পরীক্ষা দ্বারা উপযুক্ত বিবেচিত হলেই তাকে গ্রহণ

করা হত। ছাত্রদের বেতন, খাদ্য ও পোশাকের জন্য কোনও অর্থ দিতে হত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাও ছিল অতি সুন্দর, সকলকেই তা মেনে চলতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও আচার্যদের এতই মর্যাদাবোধ ও শৃঙ্খলাশক্তি ছিল যে নালন্দা স্থাপিত হওয়ার দিন থেকে পরবর্তী সাতশ' বছরের মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের একটি অভিযোগও আসে নি। শিক্ষাদানের জন্য বেদীসহ একশ' শিক্ষাগৃহ ছিল। বেদীতে বসে আচার্যরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করতেন। হিউয়েন-সাং-এর সময় বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন নালন্দার অধ্যক্ষ। শীলভদ্র সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকরূপে খ্যাত ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকও ছিলেন অতি উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন। এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্বাহের জন্য রাজা ও জনসাধারণ বহু অর্থ দান করতেন। হর্ষবর্ধন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উদারভাবে দান করেছিলেন। প্রায় একশ' গ্রামের রাজস্ব দ্বারা এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হত।

হিউয়েন-সাং-এর বিবরণে জানা যায় যে, তখন ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ধীরে ধীরে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে হূণ আক্রমণের ফলে বহু বৌদ্ধ বিহার নষ্ট হয়েছিল। পূর্ব-ভারতে তখনও বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং দাক্ষিণাত্যে জৈনধর্ম প্রবল ছিল। হিউয়েন-সাং সারা ভারতে কুড়ি লক্ষ বৌদ্ধ শ্রমণ দেখেছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হর্ষোত্তর যুগ—ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের উত্থান—রাজপুতদের ইতিহাস: হর্ষবর্ধনের কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং এর ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হল। এই সকল রাজ্যের রাজারা সাম্রাজ্য স্থাপন নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্ধকারময় ছিল। কিন্তু খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমভাগে যশোবর্মন কনৌজের সিংহাসনে উপবেশন করে কনৌজের গৌরব কিছুকালের জন্য পুনরুদ্ধার করলেন। কাশ্মীরের কর্কট বংশের প্রতিষ্ঠাতা দুর্লভবর্ধন ৬২৭ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাশ্মীর রাজ্য এই সময়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম

পাঞ্জাবের একাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুর্লভবর্ধন ও তাঁর পুত্র দুর্লভক একত্রে ৮৬ বছর কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন।

৭১৩ খ্রীস্টাব্দে দুর্লভকের পুত্র চন্দ্রাপীড় সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় মহম্মদ-বিন্-কাশিমের নেতৃত্বে আরবরা সিন্ধু জয় সমাপ্ত করে কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হল। চন্দ্রাপীড় আরবদের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের আশায় চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মহম্মদ-বিন্-কাশিম ইরাকে ফিরে গেলে কাশ্মীর রক্ষা পেল। চন্দ্রাপীড় অতি দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। আট বছর শাসন করার পর তাঁর ভাই তারাপীড় তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। এর চার বছর পরে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় সিংহাসন লাভ করেন। ললিতাদিত্য তাঁর সমস্ত রাজত্বকাল যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যজয়ে অতিবাহিত করে সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি কনৌজের যশোবর্মনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তিব্বতরাজকে পরাজিত করেন। তিব্বত যুদ্ধের পরই তিনি যুদ্ধ করে যশোবর্মনকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি একে একে গৌড় ও কলিঙ্গ জয় করে দাক্ষিণাত্যের কাবেরী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। প্রায় ৩৬ বছর রাজত্বের পর ৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ললিতাদিত্যের মৃত্যু হয়।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা বিজিত হবার সময় পর্যন্ত উত্তর ভারতে কয়েকটি শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে। এঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয় রাজপুত বলে পরিচয় দিতেন। এই রাজপুতরাজগণ উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু খ্যাতিলাভ করেননি, এঁরা এই যুগে মুসলিম রাজাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য অপরিসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ দেখিয়েছিলেন। রাজপুত জাতির বীরত্ব ও মহত্বের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রাজপুত রাজাদের কীর্তিকলাপকে কেন্দ্র করে এ যুগের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, এজন্য অনেকে একে 'রাজপুত যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। রাজপুতগণ প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত ছিলেন।

রাজপুতরা যেভাবে সর্বস্ব পণ করে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন তা হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁরের গভীর বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করে রাজপুত জাতিকে আর্য নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। অনেকের ধারণা এরা

কোন বহিরাগত জাতি হতে উদ্ভূত হয়নি; কিন্তু এই অভিমত ও যুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। বর্তমান যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতগণ হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির বংশধর। এইসকল জাতি ভারতের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে কালক্রমে ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে যারা সামরিক বিদ্যায় নিপুণ ছিল এবং শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করেছিল তারা ক্ষত্রিয়ের পদমর্যাদা লাভ করে। অবশিষ্ট সকলে নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাজপুত জাতির মোট ৩৬টি বিভিন্ন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একটি শাখা হূণ নামে পরিচিত ছিল। রাজপুত রাজাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাঁরা বহিরাগত। কিন্তু রাজপুতদের সব কয়টি শাখাই যে বহিরাগত জাতি থেকে উদ্ভুত এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। কয়েকটি শাখা ভারতীয় জাতি গোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। চন্দেল্লরা গোন্দ জাতিসম্ভূত, এটা ঐতিহাসিক স্মিথের অভিমত। গাহড়বাল রাজপুতরাও ভারতীয় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারে যে পার্থক্য দেখা যায় তা তারা যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি থেকে উদ্ভুত তা-ই সূচিত করে। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত বংশগুলির মধ্যে গুর্জর-প্রতিহার বংশ, জেজাকভুক্তির চন্দেল্ল বংশ, মালবের পরমার বংশ, গুজরাটের চালুক্য বংশ, আজমীরের চৌহান বংশ, চেদিরাজ্যের কলচুরি বংশ ছিল প্রধান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা: বাংলাদেশে ধর্মপালের শাসনকালে উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট এবং পাল বংশের মধ্যে এক ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। ধর্মপালের সমসাময়িক প্রতিহার নরপতি দুজন ছিলেন যথাক্রমে বৎসরাজ ও নাগভট্ট এবং রাষ্ট্রকূট বংশের ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দ। ধর্মপাল বাংলাদেশ ও বিহারের সীমান্তের বাইরে আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়ে পশ্চিমদিকে ও প্রতিহার নরপতি বৎসরাজ পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হলেন। তাঁদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। সম্ভবতঃ বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু এই সময় বৎসরাজ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের কাছে পরাজিত হলে তাঁর অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং তিনি রাজপুতনার মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এরপর রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব গাঙ্গেয় উপত্যকায় অভিযান করে ধর্মপালকে পরাজিত

করেন। ধর্মপাল গুর্জর, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট রাজাদের হাতে পরাজিত হলে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশে তাঁর প্রভাব সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করলে ধর্মপাল আর্যাবর্তে পুনরায় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। দক্ষিণাঞ্চলের রাজা ধ্রুবের পক্ষে উত্তর ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিহার শক্তির পুনরভ্যুদয় সাধন করেছিলেন দ্বিতীয় নাগভট্ট। তিনি স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করে কনৌজ আক্রমণ করেন। কনৌজের শাসনকর্তা চক্রায়ুধ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং ধর্মপালের নিকট আশ্রয় নেন। নাগভট্ট কনৌজ অধিকার করে সেখানে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এরপর নাগভট্ট পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং মুঙ্গেরের নিকট এক যুদ্ধে ধর্মপালকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। পাল সাম্রাজ্যের পক্ষে এই পরাজয় মারাত্মক হতে পারত কিন্তু উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূটদের হস্তক্ষেপের ফলে পাল সাম্রাজ্য রক্ষা পায়। ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। পিতার মত তিনিও আর্যাবর্তের প্রাধান্য নিয়ে গুর্জর প্রতিহার ও পাল বংশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ প্রতিহার ক্ষমতা চূর্ণ করবার জন্য উত্তরাভিমুখে অভিযান করেন। তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং তাঁর রাজ্য অতিক্রম করে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অগ্রসর হন। শেষ পর্যন্ত ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়েই তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ : শশাঙ্ক : শশাঙ্কের বাল্যজীবন ও অভ্যুদয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বিহারের রোটাসগড়ে প্রাপ্ত একটি শিলায় 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' এই লিপিটি লেখা আছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে গৌড়রাজ শশাঙ্ক এবং মহাসামন্ত শশাঙ্ক অভিন্ন ব্যক্তি এবং শশাঙ্ক প্রথম জীবনে গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্তের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে তিনি গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্তের পুত্র বা ভ্রাতৃষ্পুত্র ছিলেন এবং তাঁর অপর নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত। তাঁর বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও মহাসামন্ত শশাঙ্কই পরে গৌড়রাজ শশাঙ্ক হয়েছিলেন এটা মনে করা সঙ্গত।

৬০৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোনও একসময় শশাঙ্ক বঙ্গদেশকে গুপ্ত বংশের শাসন থেকে মুক্ত করেন এবং স্বাধীন নরপতিরূপে গৌড়-বঙ্গ শাসন করতে

থাকেন। শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নিকট কানাসোনা) রাজধানী স্থাপন করেন।

শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের মত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রণ-নিপুণতায় সপ্তম শতাব্দীর বঙ্গদেশ ভারতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। শশাঙ্ক শম্ভুযশ নামে এক রাজাকে পরাজিত করে দণ্ডভুক্তি, উৎকল এবং কনৌজ অধিকার করেন। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক পূর্ববঙ্গ জয় করে সমগ্র বাংলাদেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শশাঙ্ক মগধও জয় করেছিলেন এবং পশ্চিম দিকে তাঁর রাজ্যসীমা বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। শশাঙ্ক গুপ্তবংশীয় মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গঠন করেন। ম্যলবরাজ দেবগুপ্ত কৌনজ আক্রমণ করলে শশাঙ্ক তাঁকে সহায়তা করেন। কনৌজের রাজা গ্রহবর্মন পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হন। অতঃপর থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করে রাজ্যবর্ধন কনৌজ উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও শশাঙ্কের হাতে তিনি নিহত হলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পরই হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ছ' বছর পূর্ব-ভারতে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। অনুমান করা হয় যে, শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়নি, কারণ ৬১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক উড়িষ্যার দক্ষিণ দিকে গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত নিজ অধিকারে রেখেছিলেন এবং প্রায় ৬৩৭-৬৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মগধ শশাঙ্কের অধিকারে ছিল। শশাঙ্ক শৈব-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। হিউয়েন-সাং বৌদ্ধ উৎপীড়করূপে শশাঙ্কের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা যথার্থ নয়, কারণ শশাঙ্কের রাজধানীতে হিউয়েন-সাং বৌদ্ধ বিহারের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। রাজধানী কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধ বিহারটি ছিল অতি বৃহৎ এবং এখানে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করতেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী হলে নিজ রাজ্যে এর অস্তিত্ব রাখতেন কিনা সন্দেহ। শশাঙ্কের কোন উত্তরাধিকারী ছিল কিনা জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন।

শশাঙ্কই সর্বপ্রথম গৌড় বঙ্গকে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেন। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের ইতিহসে সর্বপ্রথম গুরুত্ব অর্জন করে। শশাঙ্কের সামরিক প্রতিভায় গৌড়-বঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি হর্ষবর্ধনের মত পরাক্রান্ত নরপতির আক্রমণ প্রতিহত করে নিজের সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সমসাময়িক কালের

বিবরণ-লেখক বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাং তাঁর শত্রুর পক্ষভুক্ত ছিলেন বলে শশাঙ্কের কৃতিত্বের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়নি বলে ধারণা। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ ৬১৯-৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ; সপ্তম শতাব্দীর শেষে কামরূপের ভাস্করবর্মন শশাঙ্কের রাজধানী দখল করেন। তখন বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজশক্তি ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের এই অরাজকতার সময়কে বলা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়'।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাল ও সেন যুগে সমাজ জীবন, ধর্ম ও শিক্ষা ঃ 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতার যুগে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ গোপাল নামে একজন নেতাকে সিংহাসনে বসায়। পাল সাম্রাজ্যের শুরু গোপাল থেকে। গোপালের পুত্র ধর্মপাল ছিলেন বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। সম্ভবতঃ ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন ও প্রায় বত্রিশ বছর দেশশাসন করেন। ৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার মত রাজ্যজয়ের জন্য অভিযান করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর আবার বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে ও বাইরে থেকে বাংলাদেশের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। প্রথম মহীপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব আবার কিছুটা ফিরে আসে।

পাল শাসনের শেষদিকে বিজয় সেন বাংলাদেশ অধিকার করেন ও সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন ও বিজয় সেন পুরুষানুক্রমে বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন বাংলাদেশের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনিই বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন বলে অনেকের ধারণা। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন সেনবংশের শেষ নরপতি।

পাল ও সেন বংশের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে একটি গৌরবময় যুগ। এই যুগে বাঙালী আর্যাবর্তে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলাদেশ গৌরবময় স্থান অধিকার করে। বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত হয়। বাঙ্গালীর মনীষা নব নব ধারায় প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশ ও জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। প্রাচীন বাঙ্গালী জাতি বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠল। বাংলার জনসাধারণ

শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না। পুরুষরা একাধিক স্ত্রীকে বিবাহ করত। উচ্চবর্ণের নারীদের ক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহ নিন্দনীয় ছিল।

বাংলাদেশ ছিল প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান। বাংলার বস্ত্রশিল্পে বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁতী, গন্ধবেনে, সোনার বেনে, কামার, কুমোর, মালাকার, কলু প্রভৃতি কারিগরদের নিজস্ব সঙ্ঘ ছিল।

পাল ও সেন যুগের পুরুষরা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি এবং মেয়েরা গোড়ালি পর্যন্ত শাড়ী পরত। মেয়ে-পুরুষ সবাই অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই মণিমুক্তা এবং মূল্যবান সোনা-রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করত। বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে নানা প্রকার ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল। নাচ, গান ও অভিনয় বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

যানবাহনের মধ্যে প্রধান ছিল গোরুর গাড়ী ও নৌকা। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা হাতি, ঘোড়া, রথ ও পালকি ইত্যাদিও ব্যবহার করতেন। পাল ও সেন যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুনাম ছিল।

তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ছিল বাংলার বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। বাঙ্গালী বণিকরা এই দুটি বন্দর থেকে সমুদ্রপথে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি দেশে তাদের পণ্য নিয়ে যেত। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও বাংলাদেশ বিশেষ উন্নত ছিল। এই যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর খ্যাতি সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় বাংলাদেশে বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল। পালবংশের শাসনকালে, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে, বৌদ্ধ এবং শৈব আচার্যগণ বহু বৌদ্ধ গান ও দোঁহা রচনা করেন। এইসব গান ও দোঁহা 'চর্যাপদ' নামে পরিচিত। এগুলি ধর্মকথা নিয়ে রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যেই আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম রূপটি দেখতে পাই। সাহিত্যক্ষেত্রে পালযুগের বিশিষ্ট অবদান আছে। এই যুগের তাম্রশাসনে বৈদিক-সাহিত্য, মীমাংসা, ব্যাকরণ, তর্ক প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু ব্যক্তির পাণ্ডিত্যের উল্লেখ আছে। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রাম-চরিত' কাব্য রচনা করেছিলেন। সেন যুগে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। দুজন সেন নরপতি, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বল্লাল সেন-রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। কবি জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। জয়দেব ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদৃত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের রচয়িতা হিসাবে।

বাংলা ভাষার প্রাবীণতম নিদর্শন পাল যুগেই পাওয়া যায়। পাল যুগের নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। নালন্দা মহাবিহারের উন্নতি পাল রাজাদের অকুণ্ঠ দানেই সাধিত হয়েছিল। ওদ্দণ্ডপুর, সোমপুর এবং বিক্রমশীলা মহাবিহার সম্ভবতঃ পাল যুগেই তৈরী হয়েছিল। সম্ভবতঃ গোপাল ওদ্দণ্ডপুর মহাবিহারের এবং ধর্মপাল বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাং বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এক স্বতন্ত্র রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। বুদ্ধ পূজায়, হিন্দু দেব-দেবীর অর্চনায অঙ্গীভূত মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। কালক্রমে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধধর্ম আচরণে স্থান লাভ করে। সেন নরপতিরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেনবংশের শাসনকালে পৌরাণিক ধর্মের শক্তিবৃদ্ধির ফলে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে ক্রমশঃ গ্রাস করে এবং বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত বিলুপ্ত হয়।

পাথর ও পোড়া মাটির কারুকার্যে বাংলার শিল্পীরা বিশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। ওদ্দণ্ডপুর মহাবিহারের অনুকরণে তিব্বতে প্রথম বিহারটি এবং সোমপুর মহাবিহারের অনুকরণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিখ্যাত দুজন শিল্পী ধীমান ও বীতপাল প্রস্তর ও ধাতু শিল্প নির্মাণে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। সেনযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শূলপাণি।

নবম পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্য : ভূমিকা : উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মদা নদী এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ সাধারণভাবে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত তামিল অঞ্চলকে কেউ কেউ 'সুদূর দক্ষিণ' বলেন, কারণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই অঞ্চলের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

বেদ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে দাক্ষিণাত্যের কোন উল্লেখ নেই। এই অঞ্চলটি ছিল দ্রাবিড় জাতি-অধ্যুষিত দেশ। আর্যদের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। রামায়ণের যুগে সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা ও উপনিবেশ বিস্তার লাভ করে। রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযানের কাহিনীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যে

আর্যদের উপনিবেশ বিস্তারের কথা জানা যায়। মৌর্য সম্রাটদের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত অংশে মৌর্য অধিকার বিস্তার লাভ করে। সুদূর দক্ষিণের চোল, চের, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি দেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল বলে অশোকের অনুশাসনে উল্লেখ আছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে দক্ষিণ ভারতের কলিঙ্গরাজ খারবেল এবং শক্তিশালী সাতবাহন রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

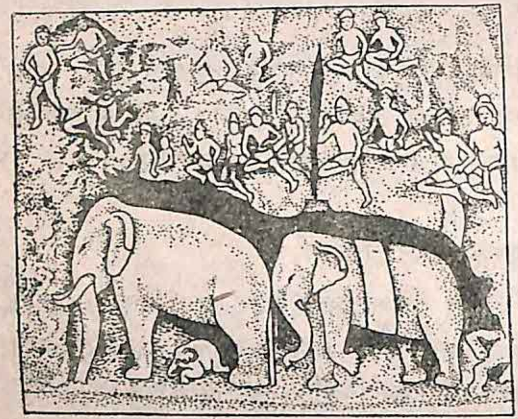
মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে বাদামীর চালুক্যগণ, কাঞ্চীর পল্লবগণ এবং চোল নরপতিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই শক্তিশালী রাজবংশগুলি দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

বাদামীর চালুক্যগণ ঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে অতি শক্তিশালী এক রজেবংশের অভ্যুদয় ঘটে। চালুক্য বংশ নামে এটি প্রসিদ্ধ। চালুক্যবংশীয় রাজারা দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অংশের উপরে আধিপত্য স্থাপন করে প্রায় দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত নিজেদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সাময়িকভাবে চালুক্য প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। দশম শতাব্দীর শেষভাগে কল্যাণীর চালুক্য রাজারা রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করে এই বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাতাপী বা বাদামী নগরকে কেন্দ্র করে চালুক্য শক্তি গড়ে ওঠে। কিংবদন্তী আছে যে চালুক্য বংশ মনু অথবা চন্দ্রবংশ থেকে উদ্ভূত এবং অতি প্রাচীনকালে চালুক্যবংশীয় রাজারা অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে জয়সিংহের নেতৃত্বে বাতাপী অঞ্চলে চালুক্য রাজ্য গড়ে উঠেছিল। জয়সিংহের পুত্র রণনাগ এই রাজ্যটিকে শক্তিশালী করেছিলেন। রণনাগের পুত্র প্রথম পুলকেশী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন।

প্রথম পুলকেশীর পর তাঁর দুই পুত্র কীর্তিবর্মন এবং মঙ্গলেশ পর পর রাজত্ব করেন। কীর্তিবর্মন পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন কীর্তিবর্মনের পুত্র। দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। পার্শ্ববর্তী বহু রাজ্য জয় করার ফলে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য গুজরাট থেকে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এই সময়ে উত্তর

ভারতের পরাক্রান্ত সম্রাট হর্ষবর্ধন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। পুলকেশী নর্মদা নদীর কাছে কোনও স্থানে তাঁকে পরাজিত করে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রভাব-প্রতিপত্তি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে-পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মন তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। পরবর্তী শাসক প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লব শক্তিকে পরাভূত করে চালুক্য শক্তি পুনঃস্থাপন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকাল পল্লবরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হয়েছিল। ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গের অভ্যুত্থানের ফলে বাতাপীর চালুক্য শক্তি নষ্ট হয়। বাতাপীর চালুক্যরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুসরণ করতেন এবং অনেকে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তাঁরা সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরী করে তাঁদের রাজ্যকে সুষমামণ্ডিত করেছিলেন। তাঁরা শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় অজন্তার কয়েকটি গুহায় প্রাচীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। এলিফান্টার সুবিখ্যাত গুহা মন্দিরগুলি তাঁদের সহায়তায় নির্মিত হয়েছিল।



অজন্তার গুহাচিত্র

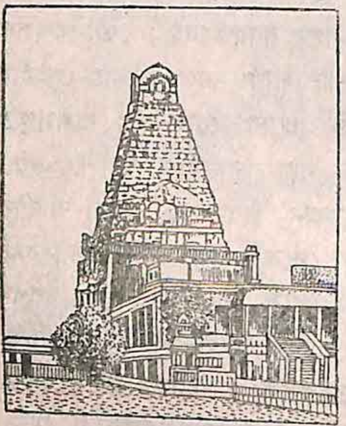
একাদশ পরিচ্ছেদ

কাঞ্চীর পল্লব নরপতিগণ : পল্লব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। 'সঙ্গম যুগে'র তামিল সাহিত্যে পল্লবজাতির কোনও উল্লেখ নাই। এ থেকে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে এরা দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসী নয়; বহিরাগত কোনও জাতি। ঐতিহাসিক স্মিটের মতে এরা বৈদেশিক পার্থিয়ান বা পহ্লবজাতিসম্ভূত। পল্লবগণ নিজেদের মহাভারতের অশ্বত্থামার বংশধর

বলে প্রচার করত। এরা একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। কয়েকজন পল্লব রাজা উত্তর ভারতীয় রাজাদের মত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু পার্থিয়ান জাতি কখনও দাক্ষিণাত্যে অধিকার বিস্তার করেছিল অথবা পার্থিয়ান রাজাদের মধ্যে কেউ কোনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন এরকম প্রমাণ নেই। সুতরাং পল্লবরা পার্থিয়ান জাতিভুক্ত ছিলেন এরকম মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ঐতিহাসিক জওসওয়াল পল্লবদের বাকাটক বংশের একটি শাখা এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এদের চোল-নাগ বংশসম্ভূত বলেছেন। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে কাঞ্চীতে পল্লব রাজবংশ স্থাপিত হয়। ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে সিংহবিষ্ণু নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা কাঞ্চীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল থেকেই পল্লব বংশের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়েছিল। সপ্তম শতকের প্রথমে সিংহবিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মন সিংহাসনে বসেন। নানা গুণে ভূষিত ছিলেন বলে 'বিচিত্রচিত্ত' নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ত্রিচিনপল্লীতে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরী হয়েছিল। তিনি নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন। 'মত্ত-বিলাস-প্রহসন' নাট্যের রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মহেন্দ্রবর্মন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হয়ে বেঙ্গি প্রদেশের অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় থেকে দাক্ষিণাত্যের প্রভুত্ব নিয়ে পল্লব ও চালুক্য বংশের মধ্যে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল তা চালুক্য বংশের পতন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চালুক্য বংশের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের অধিকার রক্ষার জন্য পল্লবদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের যুদ্ধ চলেছিল। মহেন্দ্রবর্মন প্রথমে জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে অপ্পর নামে সাধুর প্রভাবে তিনি শৈবধর্মে অনুরাগী হয়েছিলেন। শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি অনেক মন্দির তৈরী করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জৈনদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন। মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর সঙ্গে শক্তিশালী চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বার বার যুদ্ধ হয়েছিল এবং প্রতি যুদ্ধেই তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করেছিলেন। নরসিংহবর্মন স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে মহাবলিপুরম্ বা মামল্লপুরের রথ মন্দিরগুলি তৈরী হয়েছিল। এই মন্দিরগুলি পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছিল। এই মন্দিরগুলি পল্লব স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব কীর্তি। প্রথম নরসিংহবর্মনের

মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন এবং পৌত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মন যথাক্রমে রাজত্ব করেন।

পরমেশ্বরবর্মন শৈব ছিলেন এবং কাঞ্চীর নিকট কুরমে একটি সুদৃশ্য মন্দির তৈরী করেছিলেন। পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে কাঞ্চীর বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির তৈরী হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন পল্লব রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করলে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ দ্বিতীয় নন্দীবর্মনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। পল্লবদের শেষ রাজা অপরাজিতকে পরাজিত করে চোল রাজা আদিত্য পল্লব রাজ্য ধ্বংস করেন। পল্লবদের শাসনকাল থেকেই স্থাপত্য-শিল্পে প্রথম পাথরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। পল্লব শিল্প ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পক্ষেত্রে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করেছে।


দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দির

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চোলদের সামুদ্রিক বাণিজ্যে তৎপরতা: চোলরা অত্যন্ত প্রাচীন জাতি। অশোকের অনুশাসনে চোলদের উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীনকালেই চোলরা সামুদ্রিক বাণিজ্যে খ্যাতি লাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কারিকালের নেতৃত্বে চোলরা একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এরপর পাঁচ শতাব্দীকাল চোল ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কয়েকজন চোল নায়ক এই সময় চালুক্য, পল্লব ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সামন্তরূপে সুদূর দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করেন। কালক্রমে পল্লব জাতির আক্রমণে কারিকাল-প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে চোল বংশের পুনরভ্যুদয় ঘটে। বিজয়ালয়ের পুত্র প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিতকে পরাজিত ও নিহত করে পল্লব শক্তি ধ্বংস করেন। আদিত্যের পুত্র প্রথম পরান্তক

পাণ্ড্য, বাণ ও বৈদুম্ব প্রভৃতি রাজ্য জয় করে দাক্ষিণাত্যের উপর অধিকার বিস্তার করেন।

খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে চোলরাজ প্রথম রাজরাজের রাজত্বকালে চোল শক্তি পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজরাজ একে একে মহীশূরের গঙ্গ, পাণ্ড্য ও কেরল (চের) রাজ্য জয় করে সমুদ্র অতিক্রম করে সিংহল আক্রমণ করলেন। সিংহলরাজ রাম তাঁর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য রাজ্যের উত্তরাংশ ছেড়ে দেন। কল্যাণের চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এরপর তিনি চেঙ্গীর চালুক্যরাজ্য জয় করে অনুগত শক্তিবর্মনকে প্রাচ্য-চালুক্য সিংহাসন দান করলেন এবং শক্তিবর্মনের ভাই বিমলাদিত্যের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে উভয় রাজবংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। রাজরাজের শক্তিশালী একটি নৌ-বাহিনী ছিল। তার সাহায্যে তিনি পশ্চিম সাগরে লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

রাজরাজ কেবল যুদ্ধ জয় করেই খ্যাতি লাভ করেন নি। তিনি রাজ্যে সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছিলেন। তাঞ্জোরের সুবিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের মন্দির তাঁর রাজত্বকালেই তৈরী হয়েছিল। মন্দিরের গায়ে তাঁর রাজ্যজয়ের কাহিনী সবিস্তারে উৎকীর্ণ আছে। রাজরাজ শৈবধর্মের অনুরাগী হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বিষ্ণুর সম্মানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা তাঁর অনুমতি নিয়ে নেগাপত্তমে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাসে তিনি 'মহান্' রাজরাজ নামে পরিচিত। রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর রাজত্বকালে পাণ্ড্য, চের ও সিংহল দেশ চোল সম্রাজ্যের অধীনে প্রদেশরূপে শাসিত হত। তিনি মহীশূরেও গঙ্গ শক্তি ধ্বংস করেন, উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং পালবংশীয় রাজা মহীপালকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত বিজয়াভিযান চালান। রাজেন্দ্র চোল তাঁর শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের একাংশ, মালয়, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ জয় করে অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজাধিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাণ্ড্য ও সিংহলের বিদ্রোহ দমন করে চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। রাজাধিরাজের পর যথাক্রমে বীররাজেন্দ্র ও তাঁর পু

অধিরাজেন্দ্র চোল রাজ্য শাসন করেন। রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে অধিরাজেন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হন। এরপর বেঙ্গির চালুক্যবংশীয় একজন রাজকুমার প্রথম কুলোত্তুঙ্গ নাম ধারণ করে চোল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুলোত্তুঙ্গের মাতা ছিলেন প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কন্যা।

কুলোত্তুঙ্গ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন ও চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের আক্রমণ প্রতিহত করে চোল সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব কিছু পরিমাণে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে সিংহল চোল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। কুলোত্তুঙ্গের উত্তরাধিকারিগন কেউই শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁদের রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণ ও অবিরাম আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে সাম্রাজ্য ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়তে থাকে। এই সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। এই বংশের তৃতীয় রাজেন্দ্র পাণ্ড্যরাজ জটাবর্মন সুন্দর পাণ্ড্যের নিকট পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মালিক কাফুরের আক্রমণের ফলে চোল রাজ্যের বিলোপ ঘটে।

অনুশীলনী

বাস্তবীভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ভারত-ইতিহাসে কোন্ যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' আখ্যা দেওয়া হয়? ২। স্কন্দগুপ্ত কে? ৩। হূণ কারা? ৪। মিহিরকুল কে? তোরমান কে? ৬। শীলভদ্র কে? ৭ হিউয়েন-সাং কে? ৮। কোন্ বছর হর্ষের মৃত্যু হয়? ৯। ভারত-ইতিহাসে 'রাজপুত যুগে'র স্থায়িত্ব কতদিন ছিল? ১০। কয়েকটি বিখ্যাত রাজপুত বংশের নাম উল্লেখ কর। ১১। পৃথ্বীরাজ কে? ১২। তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কোন্ বছর হয়েছিল? ১৩। ধর্মপাল কে ছিলেন? ১৪। শশাঙ্ক কে ছিলেন? ১৫। দ্বিতীয় পুলকেশী কে ছিলেন? ১৬। পল্লব রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল? কার শাসনকালে মহাবলীপুরমের 'সপ্তরথ' তৈরী হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহীরূপে হর্ষবর্ধনের কার্যাবলী আলোচনা কর।
২। হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয়ের বিবরণ দাও।
৩। বাংলার রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালের বিবরণ দাও।
৪। হিউয়েন-সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৫। বাংলার জনসাধারণের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।
৬। পল্লব স্থাপত্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। ভারতে হূণরা কিভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল আলোচনা কর।
৮। উত্তর ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাল, রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর প্রতিহারদের ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ দাও।
৯। পাল ও সেন যুগে বাংলার অধিবাসীদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ।
১০। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে কৃষ্টি ও বিদ্যাচর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১১। বাতাপীর চালুক্যদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।
১২। চোলদের সামুদ্রিক বাণিজ্যে তৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?
২। ভারতে হূণদের আক্রমণ ও তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দাও।
৩। হর্ষবর্ধন কনৌজের অধিকার লাভ করার পর কি কি অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়?
৪। হিউয়েন-সাং কোন্ সময়ে ভারতে আসেন? তাঁর বর্ণনা থেকে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বধে কি জানা যায়?
৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল? নালন্দার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।
৬। হর্ষের পরবর্তীকালে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল?
৭। রাজপুত জাতির উদ্ভব সম্বধে যা জান লিখ।
৮। পল্লবদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৯। চোল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন? তাঁর কীর্তিকলাপ বর্ণনা কর।
১০। চালুক্যদের শ্রেষ্ঠ নরপতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।
১১। চোল রাজ্যের বিলোপ কিভাবে ঘটে?

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। কোন্ কোন্ গুপ্ত রাজা হূণদের পরাজিত করেছিলেন? ২। দেবগুপ্ত কে ছিলেন? ৩। রাজ্যশ্রী কে ছিলেন? ৪। দ্বিতীয় পুলকেশী কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন? ৫। রাজরাজ কে ছিলেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) শীলভদ্র সর্বশ্রেষ্ঠ—খ্যাত ছিলেন।
(খ) সেন যুগে বাপক—র চর্চা হয়েছিল।
(গ) —ছিলেন কাঞ্চীর—বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।
(ঘ) পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—।

———

দ্বাদশ অধ্যায় | বিদেশের সঙ্গে ভারতের সংযোগ

ভূমিকা ঃ উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সাগরের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বেষ্টনীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ভারত বহির্জগৎ থেকে নিজেকে কখনও পৃথক্ করে রাখতে পারেনি। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর ভারতবাসীর উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টা সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে যুগে যুগে ভারতের বাইরে প্রসারিত হয়েছে। অতীতে পরকে আপন করে নেবার সাধনায় ভারতবাসী নিজেদের নিয়োজিত করেছে এবং তাদের এই কাজের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ নিজেকে বিকশিত করে তুলেছে। ঐতিহাসিকদের অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা ও চেষ্টার ফলে বর্তমান ভারত-ইতিহাসের এই বিস্মৃত অথচ গৌরবময় দিকটি ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারত এবং পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে জলপথে ও স্থলপথে এই সকল দেশের বাণিজ্য চলত, পণ্যের আদান-প্রদান হত। স্থলপথে একদিকে পারস্য, ব্যাবিলন, সিরিয়া, গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য এবং অন্যদিকে আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সুদূর চীন পর্যন্ত হিন্দু বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত। এই দেশগুলি থেকে বণিকরা তাদের পণ্য বিক্রি করতে ভারতে আসত। কালক্রমে ভারতের অধিবাসীরা মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বহু উপনিবেশ গড়ে তুলেছে, বহু রাজ্য স্থাপন করেছে। ভারতের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও শিল্প এইসব দেশে প্রচারিত প্রসারিত হয়েছে। ভারতের উন্নত সংস্কৃতির আলোকে এই অঞ্চলগুলির অনগ্রসর জাতিগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। চীন থেকে পারস্য এবং সাইবেরিয়া থেকে যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে একদিন ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। আজও এইসব জায়গায় অনেক নগর, অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন ভারতবাসীর উচ্ছল প্রাণ ও প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করেছে। এখনও দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন জায়গায় 'রামায়ণ,' 'মহাভারত' ও 'পুরাণে'র গল্প অবলম্বনে সেখানকার পুরুষ ও মহিলারা নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্য এশিয়া এবং চীনে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঃ অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ব্যাবিলন এবং মধ্য-প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। খ্রীস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপ ও উপদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। মধ্য-এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল সেগুলিকে একত্র করে 'বৃহত্তর ভারত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একদিকে গান্ধার, কপিশা, খোটান, কাশগড় এবং অন্যদিকে মালয়, কাম্বোডিয়া, আনাম (চম্পা), সুমাত্রা



(সুবর্ণদ্বীপ), জাভা (যবদ্বীপ), বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্য-এশিয়া এবং চীনে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি প্রভাব বিস্তার করেছিল। সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্ণাশ্রমসহ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। চীন, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের কৃষ্টি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

অশোক পশ্চিম এশিয়ায় যাঁদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা আমরা জানি না। কিন্তু ভারতের

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজ্যগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের সাফল্য 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামক গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয়। বৌদ্ধ ও গ্রীক রীতির সমন্বয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে 'গান্ধার শিল্পে'র উদ্ভব হয়েছিল। কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হবার পর মধ্য-এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। কণিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন বলে তাঁর বহির্ভারতীয় সাম্রাজ্যে এই মতবাদ প্রসার লাভ করে। আনুমানিক ৬৮ খ্রীস্টাব্দে কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে একজন ভারতীয় ধর্ম-প্রচারকের সঙ্গে চীন সম্রাটের সাক্ষাৎ হয়। তারপর থেকে ভারতবর্ষ থেকে বহু ভিক্ষু এবং পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন।

অরেলস্টাইন প্রমুখ পণ্ডিত খননকার্যের পর খোটান, কাশগড়, সমরখন্দ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নিদর্শন পেয়েছেন। এইসব জায়গায় বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, বহু স্তূপ, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লেখা বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া গেছে। হিন্দুধর্মের প্রভাব তেমন কিছু ছিল না, সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম এখানে প্রথম প্রসার লাভ করে, পরে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রভাব কমে যায়। এই উপনিবেশগুলিতে যে সকল স্তূপ, বিহার ও মূর্তি আবিষ্কার হয়েছে সেগুলি তৈরীর সময় ভারতীয় রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল বোঝা যায়। আবিষ্কৃত বইগুলির পাণ্ডুলিপিগুলিও সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষায় খরোষ্ঠি বা ব্রাহ্মলিপিতে লিখিত। ধর্মগ্রন্থ ছাড়া যেসব অনুশাসন, শাসনসংক্রান্ত রাজাদেশ ও সাধারণ লোকের চিঠিপত্র পাওয়া গেছে সেগুলি ভারতীয় ভাষা ও লিপিতে লেখা। সুতরাং প্রাকৃত ভাষাই যে এদেশের জনগণের ভাষা ছিল তা বলা যায়। এই অঞ্চলে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত শহরের ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে বিচরণ করার সময় অরেলস্টাইন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন, ঐ সময় তাঁর মনে হত তিনি কোনও প্রাচীন ভারতীয় শহরের মধ্যে রয়েছেন।

অতি প্রাচীনকালেই মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কুষাণ রাজাদের আদি নিবাস ছিল মধ্য-এশিয়ায়। তাঁরা মধ্য-এশিয়ায় রাজনৈতিক প্রাধান্যও বিস্তার করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে দ্রুত প্রসার লাভ করে। কুষাণ যুগে মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা, তুরফান, কাশগড় প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ ও ভারতীয় সভ্যতার কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে

উঠেছিল। হিউয়েন-সাং মধ্য-এশিয়ার স্থলপথে ভারতে আসেন এবং ভারত থেকে ফিরে যান। তিনি এই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন। চীনের সঙ্গে ভারতের পরিচয় প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে হলেও কালক্রমে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে এই পরিচয় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। হান্‌বংশীয় সম্রাট সিং-তির রাজত্বকালে তাঁর অনুরোধে ধর্মরত্ন এবং কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে দু'জন বৌদ্ধ ভিক্ষু বহু ধর্মশাস্ত্র সহ চীনে যান। চীনে বসবাস করে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং বৌদ্ধগ্রন্থ-গুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করে জীবন অতিবাহিত করেন। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে চীনে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ ছাড়া ভারত ও মধ্য-এশিয়া থেকে বহু ভিক্ষু চীনে থেকে ধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রায় সমগ্র চীনে বিস্তার লাভ করে। চীনের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ ও সঙ্ঘারাম তৈরী হয়। এই সময় চীনে বিদেশাগত ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল ৩,৭০০। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতিও চীনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হবার পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারত থেকে দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বের পথ ধরে চীনে গিয়েছিলেন। চীন থেকেও বহু শিক্ষার্থী এবং ভিক্ষু বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে ও তীর্থপর্যটনের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। বিখ্যাত চীনা পর্যটক ইৎ-সিং (সপ্তম শতাব্দী) উল্লেখ করেছেন যে তাঁর ভারতে আগমনের পাঁচ'শ বছর আগে কুড়ি জন চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্রহ্মদেশের পথে ভারতে আসেন। বাংলাদেশের শ্রীগুপ্ত নামে একজন রাজা তাঁদের জন্য একটি মঠ তৈরী করান এবং এই মঠের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কুড়িখানি গ্রাম ও বহু অর্থ দান করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিব্বত—অতীশ দীপঙ্কর: কথিত আছে যে, ভারতের কোনও এক রাজপুত্র তিব্বতে এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে তীব্বতের রাজা স্রং-সান-গাম্পো ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। গাম্পো অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল। তিনি খোটান থেকে ভারতীয় লিপি গ্রহণ করে নিজের দেশে প্রচলন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল থেকেই তিব্বতে সংস্কৃত ভাষা এবং

ভারতীয় লিপির চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। বহু তিব্বতী পণ্ডিত ভারতে এসে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করেন। বাংলার পাল রাজ্যের সঙ্গে তিব্বতের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। একাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধাচার্য অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে সেখানে যান এবং শেষজীবন ধর্মগ্রন্থ রচনা এবং ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতেই দেহরক্ষা করেছিলেন।

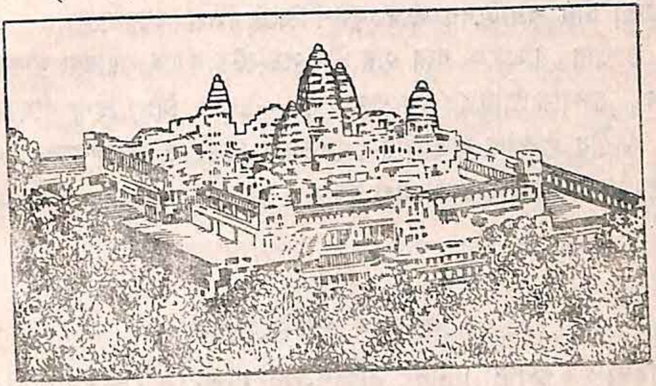
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সামুদ্রিক উপনিবেশ ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ প্রাচীনকালে 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভৃগুকচ্ছ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বন্দর দিয়ে ভারতীয় বণিকরা নিজেদের জাহাজে অজ্ঞাত সাগর অতিক্রম করে এইসব দেশে বাণিজ্য করতে যেত। এইসব বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনী 'বৃহৎ কথা', 'জাতক', প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সমুদ্রপথ ছাড়া আসাম ও মণিপুরের অরণ্যময় দুর্ভেদ্য পার্বত্যপথ অতিক্রম করেও বণিকরা ঐ সব দেশে যেত। সুবর্ণভূমিতেও ক্রমশঃ ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সুবর্ণভূমিতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের সব কিছুর পরিবর্তন হলেও প্রায় এক হাজার বছরের বেশী স্থায়ী ভারতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন এখনও এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

কম্বোজ (কাম্বোডিয়া) ঃ সুবর্ণভূমির অন্তর্ভুক্ত অন্যতম রাজ্য কাম্বোডিয়ার ভারতীয় নাম ছিল কম্বোজ। কোচিন চীন এবং কাম্বোডিয়ার দক্ষিণাংশ জুড়ে ছিল এই রাজ্যটি বিস্তৃত। চীনারা এই অঞ্চলকে 'ফু-নান' বলত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই হিন্দু রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিংবদন্তী অনুসারে কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ সমুদ্রপথে এই দেশে এসেছিলেন। তিনি স্থানীয় রাজকুমারী সোমাকে বিবাহ করে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কম্বোজ রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল। এই অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা খুবই উন্নত ছিল।

কম্বোজ রাজ্যের রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় জয়বর্মন, যশোবর্মন, দ্বিতীয় সূর্যবর্মন, সপ্তম জয়বর্মন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বংশের যশোবর্মন ছিলেন

বিজয়ী বীর, প্রতিভাধর পণ্ডিত ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সপ্তম জয়বর্মনের রাজত্বকালে আঙ্কোরথোমে কম্বোজের রাজধানী স্থাপিত হয়। নগরটি সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হয়েছিল। ঐ সময় নগরটি যশোধরপুর নামে পরিচিত ছিল। নগরটিতে কয়েকটি প্রশস্ত রাজপথ ও একটি প্রাচীরবেষ্টিত জলাশয় ছিল। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল ৮½ মাইল। এই নগরে পাঁচটি প্রবেশ-তোরণ ছিল। নগরের



আঙ্কোরভাটের মন্দির

মাঝখানে একটি বিরাট মন্দিরে সম্ভবতঃ শিবপূজা হত। ছু মাইল লম্বা ও ছু মাইল চওড়া এই নগরটির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সূর্যবর্মন আঙ্কোরভাট নামে ২১৩ ফুট উঁচু এক বিশাল বিষ্ণু-মন্দির তৈরী করেন। এই মন্দিরটি কম্বোজ হিন্দু শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এক হাজারেরও বেশী ভারতীয় ব্রাহ্মণ কম্বোজে বসতি স্থাপন করে দিনরাত শাস্ত্রচর্চায় অতিবাহিত করতেন।

সপ্তম জয়বর্মন ছিলেন কম্বোজের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। এঁর মৃত্যুর পর থেকে কম্বোজ রাজ্যের দ্রুত পতন শুরু হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে থাই জাতির আক্রমণে কম্বোজ রাজ্যটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর পরেও বহু শতাব্দী পর্যন্ত কম্বোজ রাজ্য কোনক্রমে টিকে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫০ খ্রীঃ) কম্বোজ ফরাসীদের শাসনাধীনে আসে।

চম্পা (আনাম) ঃ কম্বোজের কাছেই চম্পা (বর্তমান আনাম) নামে আর একটি বিখ্যাত হিন্দু রাজ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে ইন্দোচীনের পূর্ব উপকূলে এই হিন্দু রাজ্যটি স্থাপিত হয়েছিল। কিংবদন্তী অনুসারে একদল ভারতীয় বণিক এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করে তাদের নিজেদের

অঞ্চলের নাম 'চম্পা' (বর্তমান বিহারের অন্তর্গত) অনুসারে রাজ্যটিকে 'চম্পা' আখ্যা দিয়েছিল। এই রাজ্যের বহু সমৃদ্ধিশালী নগরে অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে শ্রীমার নামে এক রাজা চম্পায় রাজত্ব করতেন। এরপর বর্মন উপাধিধারী এক রাজবংশ চম্পায় শাসনভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরমূর্তি, হরিবর্মন, জয়সিংহবর্মন এই রাজ্যের পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। চম্পার হিন্দু রাজবংশ রাজ্যের উত্তরে টং-কি প্রদেশ অধিকার করার জন্য চীন সম্রাটদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধ-বিগ্রহে চম্পার রাজাকে বার বার চীন সম্রাটের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। চম্পায় প্রায় তের'শ বছর (১৫০-১৪৭০ খ্রীঃ) হিন্দু রাজত্ব অব্যাহত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনা ও মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে চম্পা রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

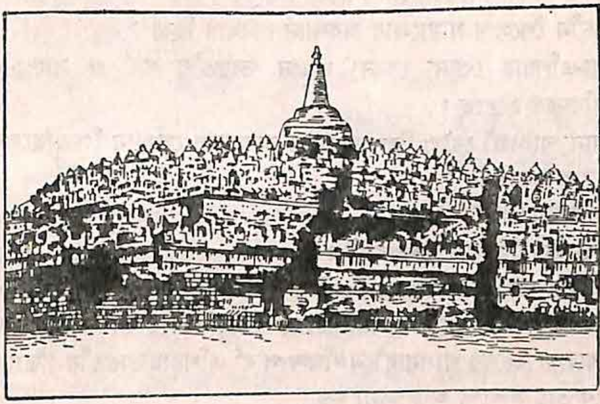
যবদ্বীপ (জাভা) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্র বংশ

যবদ্বীপ (জাভা) ঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভৌগোলিক টলেমি যবদ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ সময় যবদ্বীপে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। দেববর্মন নামে যবদ্বীপের জনৈক রাজা ১৩২ খ্রীস্টাব্দে চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম জাভায় একটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য ছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্য জাভায় আর একটি রাজ্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে বা প্রাকৃতিক কোনও বিপর্যয়ের ফলে এই রাজ্যের পতন হয়। দশম শতাব্দীতে পূর্ব-জাভায় আর একটি রাজ্যের অভ্যুদয় হয়, কিন্তু এই রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা রাজসনগরের রাজত্বকালে মজপহিতে একটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাভাতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্র বংশ ঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের শাসনাধীনে একটি পরাক্রমশালী রাজ্য গড়ে উঠে-ছিল। চীন ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে শৈলেন্দ্র নরপতিদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। আরব বণিকরা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজ্যকে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালীরূপে বর্ণনা করেছেন। শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা

'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বিশাল নৌ-বাহিনী ছিল। চম্পা ও কম্বোজের বিরুদ্ধে এই বংশের নরপতিরা সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। নবম শতাব্দীর এক আরব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শৈলেন্দ্র-বংশীয় নরপতিদের প্রতিদিন রাজস্ব ছিল দু'শ মণ সোনা। শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বাংলাদেশেও ঐ সময় পাল শাসনকালে মহাযান মতবাদের প্রাধান্য ছিল। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং ঐ মঠের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য পাঁচখানা গ্রাম চেয়ে দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু শৈলেন্দ্র নরপতিদের ধর্মগুরু ছিলেন।

শিল্পকলায় শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। বরবুদুরের বিশ্ববিখ্যাত স্তূপ শৈলেন্দ্র নরপতিদের শিল্পানুরাগ এবং অতুলনীয় স্থাপত্য কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। মধ্য যবদ্বীপের এই স্তূপটি ৭৫০-৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে তৈরী হয়েছিল। পাহাড়ের চূড়ায় চারশ' বর্গ ফুট



বরবুদুরের মন্দির

আয়তনের মন্দির নয়টি স্তরে নির্মিত। নিম্নতম স্তর লম্বায় প্রায় ১৩১ গজ। সবচেয়ে উঁচুতে ঘণ্টার আকারে তৈরী একটা বড় স্তূপ আছে। বিশালতা ও ভাস্কর্য এবং শিল্পকলায় এই মন্দির সে যুগের হিন্দুদের সৌন্দর্যচর্চার অপূর্ব নিদর্শন। পাহাড় কেটে পাহাড়ের চূড়ায় তৈরী এই মন্দিরটি যুগে যুগে দর্শকদের বিস্ময় সৃষ্টি করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। উপরের তিনটি তলে ৭২টি স্তূপের মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। প্রত্যেক তলের মন্দির প্রাচীরে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে।

শৈলেন্দ্র রাজ্য খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শক্তিশালী ছিল। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে শৈলেন্দ্র রাজ্য চোল শক্তির শাসনাধীনে আসে। কিন্তু চোল রাজ্যের পক্ষে বহুদূরবর্তী শৈলেন্দ্র রাজ্য অধিকারে রাখা সম্ভব হয়নি। এর পর শৈলেন্দ্র বংশ পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সিংহলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়ে শৈলেন্দ্র রাজ্য শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যবদ্বীপে মজপহিতের শাসকের আক্রমণে শৈলেন্দ্র রাজ্যের পতন হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মজপহিত বংশেরও পতন হয়। বর্তমানে কেবল বালিতে হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের ভাষা ও কৃষ্টিতে হিন্দু ভারতের বিশেষ প্রভাব এখনও বর্তমান।

অনুশীলনী

বাস্তবীভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। বৃহত্তর 'ভারত' কি ?
২। কোন্ অঞ্চল 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত ?
৩। প্রাচীন শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অবস্থান কোথায় ছিল ?
৪। মধ্য-এশিয়ার কোন্ কোন্ স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ?
৫। কোন্ বাঙালী বৌদ্ধ তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন ?
৬। আঙ্কোরভাট কি ?
৭। আঙ্কোরথোম কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে কি জান ?
২। কিভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল ?
৩। শৈলেন্দ্র বংশের শাসনাধীনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৪। ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। 'বৃহত্তর ভারত' বলতে কি বোঝায়। মধ্য-এশিয়া ও চীনে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বর্ণনা কর।
২। কম্বোজে ও চম্পায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন এবং সে সব জায়গায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের বিবরণ দাও।

টীকা লেখ :

যশোধরপুর, অরেলস্টাইন, কাশ্যপ মাতঙ্গ, স্রং-সান-গাম্পো, অতীশ দীপঙ্কর।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায় | দিল্লীর সুলতানদের ইতিহাস

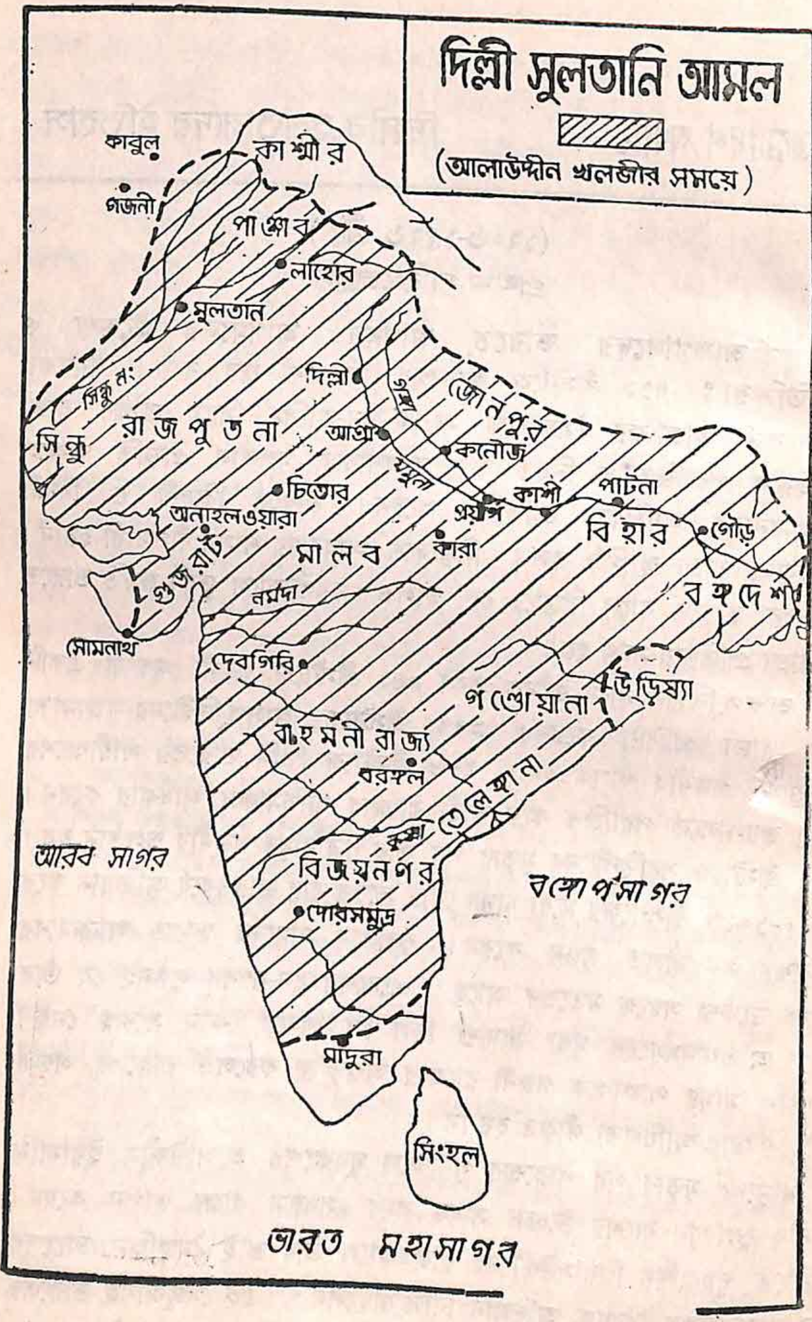
(১২০৬-১৫২৬ খ্রীঃ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্ক-আফগানদের ভারতে আগমন: আগমনের উদ্দেশ্য ও প্রতিক্রিয়া: ৭১২ খ্রীস্টাব্দে আরবগণ সিন্ধুদেশ জয় করে। ইরাকের শাসনকর্তা হাজাজের সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ-বিন্-কাসিম সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করে ব্রাহ্মণাবাদ, মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতে বিদেশী ও বিধর্মী আরবদের রাজ্য স্থাপিত হল। সিন্ধুদেশে আরবদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আরবরা ভারতে রাজ্য বিস্তারে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে তুর্কী জাতি ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়।

আলপ্‌তিগীন নামে জনৈক তুর্কী ৯৬২ খ্রীস্টাব্দে গজনী অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে আলপ্‌তিগীনের জামাতা সবুক্তিগীন গজনীর শাসক হন। ৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতের শাহীবংশের রাজা জয়পালকে পরাজিত করে শাহী রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করেন। ৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মামুদ গজনীর সুলতান হয়। ১০০০-১০২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মামুদ মোট সতের বার ভারতবর্ষে অভিযান করে এদেশের ধন-দৌলত লুণ্ঠন করেন। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এদেশের ধন-সম্পদ্ লুণ্ঠনই যে তাঁর ভারত অভিযানসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুলতান মামুদ পাঞ্জাবকে গজনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেও ভারতের অন্যত্র কোথাও তাঁর আধিপত্য স্বীকৃত হয় নি।

মামুদের মৃত্যুর পর পারস্যের পূর্বাঞ্চলে ঘুরবংশের আলাউদ্দীন ইয়ামানি গজনীর সুলতান বংশের উচ্ছেদ সাধন করে সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। গজনীতে ঘুরবংশীয় গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে তাঁর ভাই মৈজুদ্দিন ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। এই মৈজুদ্দীনই ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী মুলতান


দিল্লী সুলতানি আমল
(আলাউদ্দীন খলজীর সময়ে)
কাবুল
গজনী
কাশ্মীর
পাঞ্জাব
লাহোর
মুলতান
সিন্ধু নঃ
দিল্লী
গঙ্গা
জৌনপুর
সিন্ধু
রাজপুতনা
আগ্রা
কনৌজ
যমুনা
চিতোর
কাশী
পাটনা
প্রয়াগ
অনাহলওয়ারা
কারা
বিহার
গৌড়
গুজরাট
মালব
নর্মদা
বঙ্গদেশ
সোমনাথ
দেবগিরি
উড়িষ্যা
গণ্ডোয়ানা
বাহমনী রাজ্য
বরঙ্গল
তেলেঙ্গানা
কৃষ্ণা
আরব সাগর
বিজয়নগর
বঙ্গোপসাগর
দোরসমুদ্র
মাদুরা
সিংহল
ভারত মহাসাগর

জয় করেন। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন। কিন্তু ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী এক বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেন এবং তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি অঞ্চল মহম্মদ ঘুরীর অধিকারে আসে। এরপর ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে ছান্দোয়ার যুদ্ধে কনৌজের রাজা জয়চাঁদ পরাজিত হলে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে তুর্কী আধিপত্যের পথ প্রশস্ত হল। কুতবউদ্দীন আইবক এবং ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ-বিন্-বক্তিয়ার নামে মহম্মদ ঘুরীর দুই অনুচর উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১২৬০ খ্রীস্টাব্দে আততায়ীর হাতে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হয়। মহম্মদ ঘুরীই ভারতে প্রথম মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

মহম্মদ ঘুরী নিঃসন্তান ছিলেন। ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর কুতবউদ্দিন আইবক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র চার বছর রাজত্ব করার পর ১২১০ খ্রীস্টাব্দে সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক কুতবউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ 'দাস বংশ' নামে খ্যাত। এই বংশের পরবর্তী শাসক ইলতুৎমিস ১২২১-৩৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে দিল্লী সাম্রাজ্যের আয়তন ও সংহতি বৃদ্ধি করেন। দাস বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক গিয়াসউদ্দীন বলবন গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও কম্পিলায় হিন্দু রাজাদের পরাজিত করে দিল্লী সুলতানীর প্রতি তাঁদের বিরোধিতার অবসান ঘটান। বলবন বাংলার বিদ্রোহ দমন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন।

দাস বংশের নাবালক সুলতান কায়ুমারস্‌কে হত্যা করে জালালউদ্দীন ফিরুজ শাহ নামে পরাক্রান্ত আমীর স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন (১২৯০ খ্রীঃ)। জালালউদ্দীন ছিলেন খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। খলজীরা জাতিতে তুর্কী হলেও দীর্ঘকাল আফগানিস্থানে বসবাস করায় ঐতিহাসিক আলবারুণী তাঁদের 'তুর্কী' আখ্যা দেন নাই। এই বংশের দ্বিতীয় শাসক আলাউদ্দীন খলজী গুজরাট, রণথম্ভোর, মেবার, মালব প্রভৃতি স্থান অধিকার করে উত্তর ভারতে মুসলিম আধিপত্য সুদৃঢ় করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি, হোয়সল ও পাণ্ড্য রাজ্য অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্য জয় করার ফলে হিমালয় থেকে কুমারিকা

অন্তরীপ পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। আলাউদ্দীনের উত্তরাধিকারীরা দুর্বল ছিলেন। আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র মুবারক শাহের প্রধান মন্ত্রী খসরু খান স্বীয় প্রভুকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই খসরু খান উদ্ধত হয়ে উঠলেন।



আলাউদ্দীন খলজী

কিছুকাল পর খসরু খানের শিরশ্ছেদ করে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক 'গিয়াসউদ্দীন তুঘলক' উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিয়াসউদ্দীন করৌনা তুর্কী বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁর শাসনকালে সুলতানের ছেলে জুনা খাঁ বরঙ্গল, দিল্লী সাম্রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত করেন। সম্ভবতঃ জুনা খাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুসারেই গিয়াস্উদ্দীন তুঘলক নিহত হন।



মহম্মদ-বিন্-তুঘলক

জুনা খাঁ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খোরাসান, ইরাক ও কারাজলের পার্বত্য অঞ্চলে ব্যর্থ অভিযান করে প্রচুর অর্থ ও সামরিক সম্পদ নষ্ট করেন। মোঙ্গলরা পাঞ্জাব, লাহোর ও মুলতান অধিকার করে দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হলে মহম্মদ-বিন-তুঘলক অর্থের বিনিময়ে দিল্লী সাম্রাজ্য মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর শাসনকালে দেবগিরি এবং হোয়সল রাজ্য দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হল, বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং সিন্ধু প্রদেশ বিদ্রোহী হল। পরবর্তী শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলক সাম্রাজ্যের হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের বিশেষ প্রচেষ্টা করেননি এবং তাঁর সামরিক অভিযান-

গুলির অধিকাংশই ব্যর্থ হয়। ফিরোজ শাহের পরবর্তী তুঘলক শাসকগণ দুর্বল ছিলেন। ১২৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাইমুরের ভারত আক্রমণ দিল্লী সুলতানীর শাসনের পতন আসন্ন করে তুলেছিল। দুর্বল সৈয়দ (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ) এবং লোদী বংশের (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ) শাসকরা দিল্লী সুলতানীর এই পতন কিছুটা রুখেছিলেন মাত্র। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ—হিন্দুধর্ম ও ইসলামের পারস্পরিক প্রভাব—সাহিত্য ও শিল্পের উদার বিকাশ —ভক্তি আন্দোলন ঃ ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। বহু মুসলমান এদেশে এসে বসবাস করতে থাকে এবং নানা কারণে অসংখ্য ভারতবাসীও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক রীতি-নীতিতে গণতান্ত্রিক ভাবধারার ফলে মুসলমানরা স্বভাবতই হিন্দুদের কাছ থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে রেখেছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল একসঙ্গে ভারতে বসবাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের বিভেদ অনেকটা দূরীভূত হয়। কালক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা তুর্ক-আফগান যুগের শেষভাগে দেখা যায়।

মুসলমান সম্রাটরা রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাটের পরেই সমাজে ছিলেন অভিজাতরা। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আমীর-ওমরাহগণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। আধুনিককালের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুসলমান যুগে ছিল না ; তবে চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, কেরানী ইত্যাদিও মধ্যযুগে ছিল। সমাজের নিম্নস্তরে ছিল দেশের অসংখ্য কৃষক ও শ্রমজীবী। অসংখ্য হিন্দু এই সময় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার ফলে কতকগুলি হিন্দু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। রাজকর্মচারীদের উৎপীড়নে প্রজা, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি দুরবস্থায় জীবন কাটাত। সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রমিক, ভৃত্য, দোকানদার প্রভৃতির জীবন ক্রীতদাসের জীবনের চেয়ে উন্নত ছিল না। হিন্দু সমাজে

সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, পণ-প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। পর্দা-প্রথা মুসলমান স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অবরোধ প্রচলিত হল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল।

মুসলমান যুগে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করত। এই যুগে গ্রামীণ জীবনের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নি। বর্তমান কালের মত মধ্যযুগেও কৃষিকাজেই অধিকাংশ দেশবাসী নিযুক্ত ছিল। কৃষির পদ্ধতিও ছিল বর্তমান কালের মত—লাঙল দিয়ে কৃষিকাজ হত। কৃষককে প্রকৃতির মর্জির উপর নির্ভর করতে হত; অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে সময় সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। যানবাহনের অভাব থাকায় দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর অসুবিধা হত; ফলে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকত না, বহু লোকের মৃত্যু হত। সুতির কাপড় উৎপাদন ছাড়া এযুগের শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাগজ, রেশমী বস্ত্র, শাল, গালিচা, চিনি, জুতা ও সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদন। জাহাজ তৈরীর কারখানাও ছিল। হিন্দুদের নানাপ্রকার কর দিতে হত। জিজিয়া ও তীর্থকর ছাড়া উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ তাদের রাজস্ব দিতে হত।

কারও কারও মতে তুর্ক-আফগান যুগের স্থাপত্য-রীতি সম্পূর্ণরূপে ইসলামীয় কিন্তু প্রখ্যাত শিল্পী হ্যাভেলের মতে হিন্দুরীতি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে এই রীতির উদ্ভব হয়েছিল। তুর্ক-আফগান যুগে আমীর খসরু রাগ-সঙ্গীতে যে সুরের প্রবর্তন করেছিলেন তা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি রচনা করেছিল। ভারতীয় 'বীণা' এবং পারস্য দেশীয় 'তাম্বুরা'র সমন্বয়ে খসরু 'সেতার' তৈরী করেছিলেন। তিনি পুরানো 'মৃদঙ্গ' পরিবর্তন করে 'তবলা'র উদ্ভাবন করেছিলেন। তুর্ক-আফগান যুগে আরবী ভাষায় বহু ধর্মগ্রন্থ, ব্যাকরণ, কোরান ও হাদীসের ব্যাখ্যা রচিত হয়েছিল। এই যুগে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী সাহিত্যেরও যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকলেও তুর্ক-আফগান যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ অব্যাহত ছিল। এই যুগের ধর্মসংস্কারকরা সংস্কৃতের পরিবর্তে সহজবোধ্য লৌকিক ভাষায় ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন। এর ফলে হিন্দী, উর্দু এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলি বিকাশ লাভ করে।

ভক্তি আন্দোলন ঃ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানরা ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু করেছিল। ইসলামের সংস্পর্শে

একদিকে যেমন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা দেখা গিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি উদার মতাবলম্বী ধর্মসংস্কারকরা 'ভক্তিবাদ' প্রচার করার ফলে উদার ধর্ম-নীতিরও উদ্ভব হয়েছিল। মধ্যযুগের ভারতে ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে বাংলার শ্রীচৈতন্য, পাঞ্জাবের নানক ও বারাণসীর কবীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য ঃ ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ বছর বয়সে শ্রীচৈতন্য সংসারধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করে প্রেম ও বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি বারাণসী, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে স্বীয় ভক্তিধর্ম প্রচার করেছিলেন। যবন হরিদাস তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। তাঁর মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভাগবত প্রেমই মুক্তির একমাত্র উপায়। জীবনের শেষ আঠার বছর পুরীতে কাটিয়ে এখানেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

নানক ঃ নানক মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তিনি ছিলেন শিখ ধর্মের প্রবর্তক। ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোর জেলার তালবন্দী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ধর্মকর্মে গভীর অনুরাগের ফলে লেখাপড়ায় তিনি আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারেন নি। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সংসার ত্যাগ করে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের যা কিছু মহান্ তার উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর ধর্মমত রচনা করেছিলেন। নানক জাতিভেদ মানতেন না এবং একেশ্বরবাদে অর্থাৎ 'ঈশ্বর এক' এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের বাহ্যিক

অনুষ্ঠানসমূহেরও বিরোধী ছিলেন। গুরু নানকের উপদেশগুলি 'গ্রন্থসাহেব' (শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) বইটিতে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থসাহেব শিখদের ধর্মপালনে প্রধান অঙ্গ। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই গুরু নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।



নানক



কবীর

কবীর ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, আনুমানিক ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে কবীর কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; তাঁর মৃত্যুকালও সঠিক জানা যায়নি। কিংবদন্তী অনুসারে এক ব্রাহ্মণ বিধবার পরিত্যক্ত সন্তান কবীর নিরু নামে জনৈক মুসলমান তাঁতীর ঘরে পালিত হয়েছিলেন। কথিত আছে, তিনি গুরু রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কবীর ধর্মীয় শিক্ষাপ্রচারের মাধ্যমে উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় দুটির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু বা মুসলমানের স্বতন্ত্র ধর্মানুষ্ঠানে তাঁর কোনও আস্থা ছিল না। তাঁর মতে হিন্দু ও মুসলমান একই মাটিতে তৈরী দুটি পাত্রবিশেষ। উত্তর ভারতের অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী যুগে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ মধ্যযুগের শাসন-ব্যবস্থা ঃ ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী বংশ দুটির শাসনাধীনে বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুদের জিজিয়া কর দিতে হত, সরকারের উচ্চপদে কাজ করার

আশা তাদের ছিল না। রাজনৈতিক সমস্ত অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে জোলা, কসাই প্রভৃতির কাজ করত। ধনী লোকরা বহু বিবাহ করত। ধনী লোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাস-দাসী আসত। পর্দার ব্যবস্থা খুব কঠোর ছিল। নর্তকীদের নাচ-গান মুসলমান সমাজে খুবই আদৃত হত।

মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ফারসী ভাষায় হত। অনেকে আরবী ভাষার চর্চ্চাও করতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষায় হত। কিছু সংখ্যক অভিজাত মুসলমান উর্দু ভাষা ব্যবহার করতেন; তা ছাড়া সকলেই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলত। মধ্যযুগের বাংলায় স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন, অলঙ্কারশাস্ত্রে রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন সুলতানই নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করতেন। কড়ি দিয়ে সাধারণ কেনা-বেচার কাজ হত। বাংলাদেশ ধন-দৌলতে বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। দেশের শস্য-সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্যই ছিল এর প্রধান কারণ। ঐ সময়ে বাংলাদেশে গাছের বাকল থেকে উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরী হত। মধ্য-যুগের লাক্ষা এবং রেশম শিল্পও বিখ্যাত ছিল। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতা লিখেছেন যে বাংলাদেশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হত। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গুড়, সুপারি, তামাক, তেল, আদা, পাট, মরিচ, ফল প্রভৃতি বাংলাদেশ থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও বাইরে চালান যেত। বাঙ্গালী বণিকরা সওদা নিয়ে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়াতে যেত। ভারতের সর্বত্র বাঙ্গালী সওদাগরেরা বাণিজ্য করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুব রমরমা থাকলেও বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। ভারত ও ভারতের বাইরের বহু দেশ মধ্যযুগে বাংলার ঐশ্বর্য ও সম্পদ্‌কে ঈর্ষা করত। এমনি ছিল বাঙালীর সমৃদ্ধ অবস্থা।

মধ্যযুগের শাসন-ব্যবস্থা ঃ শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আসনে ছিলেন সুলতান। সুলতানের প্রধান কর্তব্য ছিল ইজ্‌মা বা ধর্মের রক্ষণ, প্রজাদের বিরোধের মীমাংসা করা, রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা, ফৌজদারী দণ্ডবিধি কার্যকর করা, প্রতিকূল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কর ও রাজস্ব আদায় করা এবং রাষ্ট্রের সর্বত্র কর্মচারী নিযুক্ত করা।

কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন উজীর বা প্রধান

মন্ত্রী, যিনি রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। শাসন-ব্যবস্থার অন্যান্য প্রধান বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন ওয়াকিল-ই-দার (রাজার ব্যক্তিগত কর্মচারী), আমীর-ই-হাজীর (দরবারের ভারপ্রাপ্ত), মুস্তৌফি-উ মুসালিক (হিসাবপরীক্ষক), দেওয়ান্-ই-রিসালত (জনকল্যাণ বিভাগ), দবীর্-ই-খাস (যোগাযোগ দপ্তর) প্রভৃতি। সুলতানী যুগে সাম্রাজ্যের সঙ্কোচন ও প্রসারণ অনুসারে প্রদেশের সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ ছিল। প্রাদেশিক শাসকদের বলা হত 'শিকদার'।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। সুলতান মামুদ কে ?
২। সুলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন ?
৩। পৃথ্বীরাজ কে ছিলেন ?
৪। তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল ? এই যুদ্ধে কে জয়ী হন ?
৫। দাস বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান কে ?
৬। তুর্ক-আফগান যুগের কোন্ শাসক সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন ?
৭। মালিক কাফুর কে ?
৮। কোন্ সুলতানের সময় থেকে দিল্লী সুলতানীর পতন দেখা দিয়েছিল ?
৯। আমীর তাইমুর কত খ্রীস্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ করেছিলেন ?
১০। তুর্ক-আফগান সুলতানীর শেষ শাসক কে ?
১১। বাবর কত খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
১২। মালাধর বসু কি রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ?
১৩। কে তাঁকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দিয়েছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। ভারত আক্রমণে মুসলমানদের উদ্দেশ্য কি ছিল ?
২। মহম্মদ-বিন্-কাশিম সিন্ধুর কোন্ কোন্ অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন ?
৩। ইলতুৎমিস কিভাবে দিল্লী সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন ?
৪। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে আলাউদ্দীনের বিজয়-অভিযানগুলির বর্ণনা কর।
৫। মুসলমান যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।
৬। সুলতানী আমলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?
৭। মুসলমান যুগে হিন্দুদের কি কি কর দিতে হত ?
৮। মুসলমান আমলে শিল্প সম্বন্ধে কি জান ?

৯। মুসলমান যুগে সঙ্গীত ও সাহিত্যের কিরূপ বিকাশ হয়েছিল ?
১০। মুসলমান যুগে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম-সমন্বয় সম্বন্ধে কি জান ?
১১। সুলতানী যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নাম কর।

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। কিভাবে তুর্কী জাতি ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল ?
২। কিভাবে মুসলমানদের আধিপত্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
৩। দিল্লী সুলতানীর ক্রমিক অবনতির ইতিহাস আলোচনা কর।
৪। সুলতানী যুগে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?
৫। 'ভক্তি আন্দোলন' বলতে কি বুঝ ? এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীরের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬। ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী যুগে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা কর।
৭। তুর্ক-আফগান সুলতানীর শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।
(খ) — খ্রীষ্টাব্দে সুলতানী আমলের অবসান ঘটেছিল।
(গ) ভক্তিবাদ — মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিল।

ভুল সংশোধন কর :

(ক) সুলতান মামুদ রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন।
(খ) ইলতুৎমিস মোঙ্গলদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।
(গ) বলবন দুর্বল সুলতান ছিলেন।
(ঘ) ফিরোজ তুঘলক অর্থের বিনিময়ে দিল্লী সাম্রাজ্য মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন।

মৌখিক প্রশ্নাবলী :

১। সবুক্তগীন কে ছিলেন ? ২। মহম্মদ ঘুরী কে ? ৩। কুতবউদ্দীন আইবক কে ছিলেন ? ৪। ইলতুৎমিস কে ? ৫। বলবন কে ছিলেন ? ৬। আলাউদ্দীন খলজী কে ? ৭। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কে ছিলেন ? ৮। ফিরোজ তুঘলক কে ছিলেন ? ৯। কবীর কে ? ১০। নানক কে ? ১১। 'গ্রন্থসাহেব' কি ? ১২। শ্রীচৈতন্য কে ছিলেন ?

———

প্রথম পরিচ্ছেদ

রেনেসাঁস ও ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহ ঃ মধ্যযুগের সূচনার যেমন কোনও নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা দুঃসাধ্য, ঠিক তেমনি মধ্যযুগের অবসানের কোনও নির্দিষ্ট তারিখ বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দকে কেউ কেউ আধুনিক যুগের প্রারম্ভ হিসাবে পরিগণিত করেন। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টানটিনোপল যখন অটোম্যান তুর্কীদের হস্তগত হয় তখন থেকেই ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। কন্‌স্টানটিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনেরও অবসান হয়। এই শহরের পণ্ডিতরা কন্‌স্টানটিনোপল ত্যাগ করে ইউরোপের নানা জায়গায়, বিশেষতঃ ইতালীর শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের ইউরোপে আসার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠতে থাকে। এইজন্য ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দকে কেউ কেউ আধুনিক যুগের শুরু হিসাবে গণনা করেছিলেন।

রেনেসাঁস কথার অর্থ 'পুনর্জন্ম' বা নবজাগরণ। রেনেসাঁস বলতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি জানবার এক অদম্য উৎসাহ বুঝায়। পুরাতন সব কিছু জেনে তা যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝে তা থেকে যা ভাল তা গ্রহণ করবার আগ্রহ রেনেসাঁসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জানবার আগ্রহ কেবল প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, বিজ্ঞান, ভাস্কর্য ও ললিতকলা—সব ক্ষেত্রেই নূতন চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেল।

রেনেসাঁসের যুগে কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, স্যার আইজাক নিউটন প্রভৃতি খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আবির্ভূত হয়েছিলেন। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে এই সত্য কোপারনিকাস আবিষ্কার করেন। মধ্যযুগের জ্যোতির্বিদরা মনে করতেন যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি ঘুরছে। কোপারনিকাস এই মত ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। ইতালীর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে কোপারনিকাসের মত অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন তাঁর বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ নীতি আবিষ্কার করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার শুরু হলে সাহিত্য জগতে এক যুগান্তর ঘটল। ছাপাখানায় ছাপার কাজ হবার ফলে

সস্তায় বই পাওয়া গেল। বই পড়া কেবল পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না; সমগ্র ইউরোপে প্রাচীন লেখকদের লেখা গ্রন্থগুলি পড়বার এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিল।

রেনেসাঁস যুগের সূচনায় নাবিকের কম্পাস, সমুদ্রের মানচিত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। রেনেসাঁসের ফলে যে ব্যাপক জ্ঞানস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল তা ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস, ক্যাবট, ম্যাগেলান প্রভৃতি নাবিকরা মশলার দ্বীপ তথা প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপের মানুষদের পরিচয় করিয়ে দিল। সমুদ্রপথে যোগাযোগ রাখবার জন্য সমুদ্রযাত্রার বিপদ তুচ্ছ করে বার বার দেশগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা তাঁরা করেন। প্রাচ্য দেশগুলিতে জাহাজে করে পৌঁছবার সময়ই ইউরোপের নাবিকরা আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ আবিষ্কার করেছিলেন। ভৌগোলিক আবিষ্কারে পর্তুগাল ও স্পেনের নাবিকরা বিশেষ দক্ষ ছিল।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আট্‌লান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে সামুদ্রিক বাণিজ্য পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি। নাবিকদের আবিষ্কার এবং নূতন দেশের নূতন অভিজ্ঞতা সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে আমরা ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ ইউরোপের প্রসার ঃ মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে শাসননীতি সম্পর্কে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এই সময় থেকে ইউরোপের নানা স্থানে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। ফরাসীদের রাজা এই সময় থেকে আর ফ্রাঙ্ক গোষ্ঠীর রাজা রইলেন না, ওই দেশে বসবাসকারী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরও তিনি ছিলেন রাজা। এই সময় তিনি তাঁর গোষ্ঠীগত আনুগত্য বা বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি পোপের প্রজা ছিলেন না। সামন্ততন্ত্রের অবসান, বারুদের আবিষ্কার এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার রাজাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছিল। এই যুগে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, যা থেকে জাতীয়তাবাদেরও সৃষ্টি হয়েছিল। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড ও সুইডেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

হল্যাণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল স্পেনের অধীন ছিল। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের গোঁড়া ধর্মনীতিতে উত্যক্ত হয়ে হল্যাণ্ড বিদ্রোহী হয় এবং শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় (১৬৪৮ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস্ স্টুয়ার্ট শাসকদের স্বৈরাচারী নীতি ইংলণ্ডে আবার চালু করতে চাইলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ এক বিপ্লব করে। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের এই গৌরবময় বিপ্লবের পর পার্লামেন্টের ক্ষমতা বজায় রাখার অধিকারকে বহুলাংশে খর্ব করেছিল।

এই সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি পড়ে। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের মত সুদূর দেশের সঙ্গে তখন ইউরোপবাসীর পরিচয় ঘটেছিল, আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়েছিল, পরে আফ্রিকা ও আরও পরে অষ্ট্রেলিয়া। এই সকল দেশে ভৌগোলিক অভিযান-গুলি কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বাড়ায় নি, এই দেশগুলিতে এসে পরস্পরের বসবাস ও বাণিজ্যের আদান-প্রদানের জন্য ইউরোপের চেহারা অনেক বদলে দিয়েছিল। পুরানো ধ্যান-ধারণার অবসান হল, জনগণের মধ্যে সমালোচনার আগ্রহ দেখা দিল। যুক্তিবাদ ও বিচারবুদ্ধি চিরাচরিত বিশ্বাস ও অন্ধ ধর্মভাবের স্থান গ্রহণ করল। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর জন্ম নিল নূতন সমাজ চেতনা এবং জনকল্যাণকর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীরা কনস্টানটিনোপল শহর অধিকার করার পর থেকেই মধ্যযুগের অবসান হল বলা যায়। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি তখন থেকে ফুটে উঠতে থাকে।

অনুশীলনী

বাস্তবীভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। রেনেসাঁস কি ? ২। ভৌগোলিক আবিষ্কার বলতে কি বোঝ ? ৩। অটোম্যান তুর্কীরা কত খ্রীস্টাব্দে কনস্টানটিনোপল অধিকার করেছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। অটোম্যান তুর্কীরা কিভাবে রাজ্য গঠন করেছিল ?

২। কি কি কারণে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হয়েছিল ?

৩। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের উপর ইউরোপের দৃষ্টি পড়েছিল কেন ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ২। রেনেসাঁসের ফলে জনগণের জ্ঞান কিভাবে সম্প্রসারিত হল, সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৩। ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ। এই আবিষ্কারগুলির ফলাফল আলোচনা কর। ৪। জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।